মরু-মায়া

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ নাথ
নাথ ব্রাদার্স
২৩-সি, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩৫২

দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬নং চালতাবাগান লেন, কলিকাতা

প্রতিভাধর নাট্যকার

যশস্বী অভিনেতা

প্রিয়বন্ধু

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

করকমলেষু

মরু-মায়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীন ঔপন্যাসিক

জোড়াপুকুর স্কোয়ারের দক্ষিণে মস্ত একখানা চার-তলা বাড়ী। এই বাড়ীটিতে নানা-জাতের নানা শ্রেণীর ভাড়াটিয়ার বাস। পায়রার খোপে অসংখ্য পায়রা যেমন সর্ব্বক্ষণ গুঞ্জন-রব তুলিয়া খোপ্‌টিকে মুখরিত রাখে, এ-বাড়ীও তেমনি বিচিত্র ভাড়াটিয়া-জীবের কল-কোলাহলে সারাক্ষণ গম্‌গম্‌ করিতেছে। ভাটিয়া, মাড়োয়ারি, শিখ, মগ—সকল জাতি এই গৃহ-কোটরে আশ্রয় পাইয়াছে। রাস্তার ধারে দোতলার দুটা বড় ঘর লইয়া এক-দল বাঙালী বাবু এক অফিস খুলিয়াছেন। অফিস মানে,

মাসিক-পত্রের কার্য্যালয়। বাহিরের দেওয়ালে প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ড। সাইনবোর্ডে লেখা আছে,—

মঞ্জরী কার্য্যালয়

মাসিক-পত্রখানির নাম যে মঞ্জরী, সে কথা বলা বাহুল্য।

আগামী বৈশাখে মঞ্জরীর সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইবে। সেজন্য আয়োজনও চলিয়াছে ভারী সমারোহে।

ফাল্গুনের শেষ। এখন হইতেই মঞ্জরীর নববর্ষের নব-আয়োজনে লেখক ও হিতৈষী বন্ধুর দল চব্বিশ ঘণ্টা সদুপদেশ লইয়া হাজিরা দিতেছে। দু'চারজন করিয়া নবীন চিত্র-শিল্পীও দেখা দিতেছে—হাতে কভারের বিচিত্র নূতন ডিজাইন। সম্পাদক মোহিনীমোহন বল্লভ ও সহকারী সম্পাদক বংশীলাল রক্ষিত অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে ডিজাইন দেখিতেছে—কোনোটাই আর মনঃপূত হয় না! কবি করালীচরণ পাত্র কাছে বসিয়া ছিল। সে কহিল—একটা বিজ্ঞাপন দিন্ মশায় যে, মঞ্জরীর কভারের জন্য original ডিজাইন চাই। যাঁর ডিজাইন মনোনীত হবে, তাঁকে নগদ পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক-হিসাবে দেবেন। পনেরো দিনে পনেরো-শো ডিজাইন মজুৎ পাবেন।

মোহিনী বল্লভ কহিল—পঞ্চাশ টাকা! পাগল হয়েচো! বড়-জোর দশ টাকা দিতে পারি। কি বলো হে বংশী?

মোহিনীর কথায় এক শীর্ণকায় যুবা কহিল,—তা নয় তো কি! তবে আমার ইচ্ছা কি, জানো?

করালী কহিল,—কি ?

বংশী কহিল,—ব্লকে খরচ আছে। কাজেই ডিজাইনটা বিনা-মূল্যে সংগ্রহ করতে পারলে ভালো হয়।

করালী কহিল,—না, না। মঞ্জরীর একটা নাম বেরিয়েচে। যার-তার যা-তা ডিজাইনে চলবে না। চারু রায় কি পূর্ণ ঘোষকে না পারেন, তবু বিজ্ঞাপন দিন। এই ডিজাইনের বিজ্ঞাপনে মঞ্জরী নামটারও প্রচার হবে। ডিজাইনে যেমন কিছু খরচ করবেন, তেমনি ঐ বিজ্ঞাপনে পনেরোটা নতুন গ্রাহক পেলে পনেরো ইন্‌টু তিন টাকা ছ আনা...পঁয়তাল্লিশ টাকা প্লাশ নব্বই আনা অর্থাৎ টোটালে পঞ্চাশ টাকা দশ আনা গ্রাহক-মারফৎ নগদ পেয়ে যাবেন। প্রচারের দিক দিয়েও সেটা মস্ত লাভ!

ঘরের কোণে একখানা পালিশ-ওঠা চেয়ারে এক শুষ্ক-মূর্ত্তি তরুণ বসিয়া ছিল। ম্লান-মুখে কিসের চিন্তায় সে বিভোর। ব্যাকুল আগ্রহে বেচারী এই সরস কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। বেলা তখন...দেওয়ালের গায়ে একটা ঘড়ি। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিতে তেরো মিনিট বাকী

মোহিনী কহিল,—বিজ্ঞাপন তো অন্য রকমেও দেওয়া যায়। তাতে শুধু বিজ্ঞাপন-খরচই লাগবে। আর্টিষ্টের দাম-বাবৎ বাজে খরচ হবে না।

বংশী কহিল,—ডিজাইন গ্রহণ করলেই কৃতার্থ হবে, এমন আর্টিষ্টের অভাব নেই দেশে। আইডিয়া বলে দিতে পারি—

গোটাকতক আমের বউল এঁকে দিলেই হলো—যত প্লেন হবে, ততই artistic হয়েচে বলে তারিফ মিলবে। নয় কি?

কথাটা বলিয়া বংশী হো-হো করিয়া হাসিয়া কোণে-উপবিষ্ট সেই তরুণটির পানে চাহিল। এ-হাসিতে তরুণ মৃদু হাসি মিলাইতে বংশী সেটুকু লক্ষ্য করিল। বংশী তার পানে চাহিয়া কহিল,—আপনি চুপ করে করে বসে আছেন...কি চাই? কোনো বিল-টিল আছে না কি?

তরুণ কহিল,—আজ্ঞে না...

মোহিনী ও করালী তার পানে চাহিয়া দেখিল। মোহিনী কহিল,—কোনো লেখা-টেখা আছে বুঝি?

তরুণ বিনয়ের ভঙ্গীতে কহিল,—হ্যাঁ...

মোহিনী কহিল,—গল্প? না, কবিতা? কবিতার স্থান নেই। আমাদের দলে বহু কবি,—তাঁদের লেখা ছাপতেই পাতা ভরে ওঠে।

তরুণ কহিল,—কবিতা নয়। উপন্যাস!

করালী কহিল,—সামাজিক উপন্যাস, নিশ্চয়?

তরুণ কহিল,—হ্যাঁ।

মোহিনী কহিল,—Modern problems নিয়ে? অর্থাৎ এই sex, কিম্বা eternal triangle?

তরুণ কহিল,—আজ্ঞে, না। উপন্যাসখানা আমি দিয়ে গেছি সেই বড় দিনের সময়। আপনি বলেছিলেন, ফাগুনের মাঝামাঝি আসতে...

মোহিনী কহিল,—কি নাম আপনার, বলুন তো...

তরুণ কহিল,—অবনীলাল সেন।

কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া করালী কহিল,—অবনী সেন! নতুন লেখক?

তরুণ কহিল,—আজ্ঞে, এই আমার প্রথম লেখা। আপনাদের লেখক সরোজবাবু আমার লেখাটা পড়েচেন। তাঁরি কথায়...

মোহিনী কহিল,—আপনার উপন্যাসের নাম?

অবনী কহিল,—গ্রামের মেয়ে।

মোহিনী কহিল,—বুঝেচি। তা দেখুন, ও-নাম একালে অচল। নাম দেখেই পড়িনি। এখন sex চাই, sex...দেশের যা হাওয়া, তাই বুঝে লিখতে হবে তো। আমাদের যে উপন্যাস এ বছর বেরুচ্ছে...ঐ যে চ্যবন দত্তর 'কুঞ্জতলে রূপসী বিবর্জ্জিতা' —পড়চেন, নিশ্চয়! ঐ ধরণের লেখা আমরা চাই। একেবারে complicationএর উপর complication. ঘর-দোর ভেঙ্গে প্রচণ্ড তাণ্ডবে বিপ্লবের মাতন-স্থর। নামও দেবেন তেমনি—'প্রাণের ভেল্‌কি,' নয় তো 'কুলনাশার মত্ত নেশা'। তবেই পশার করতে পারবেন। গ্রামের মেয়ে, পল্লীবধূ—এ-সব tame ব্যাপারে এ-যুগে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না!

অবনী বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমার লেখাটা তাহলে পড়েন নি?

মোহিনী কহিল,—না। উপন্যাসের নাম দেখে পড়ার প্রবৃত্তি হয় নি, তা মশায়, স্পষ্টই স্বীকার করচি।

অবনী কহিল,—যদি না চলে, দয়া করে তাহলে ফেরত...

মোহিনী কহিল,—বেশ। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই আপনাকে। আপনি *young man*, লেখায় উৎসাহ আছে—সামনে মস্ত ভবিষ্যৎ। ও মামুলি পথে না ঢুকে পড়েন...

বংশী কহিল,—কৈ, বার করো তো ওঁর বইখানা। নামটা বদলে যদি চালানো যায়, বেশ catchy একটা নাম দিয়ে...দেখা যাক্ না!

—ছ্যাখো। বলিয়া মোহিনী উঠিয়া সামনের আলমারি হইতে একখানা মোটা বাঁধানো খাতা বাহির করিল।

বংশী কহিল,—দু'চার পাতা পড়ে দেখি।

খাতাখানি হাতে লইয়া বংশী তার দু' চার পাতা উল্টাইয়া একটা পৃষ্ঠায় মনোযোগ অর্পণ করিল। তিন-চার পৃষ্ঠা পড়িয়া সে কহিল,—আপনার লেখা মন্দ নয়। চর্চ্চা করলে দাঁড়াতে পারে। তবে আমরা গাইড্ করি যদি...! তা দেখুন, এই যে আপনি লিখেচেন, কিরণমালা পুকুর-ঘাটে বাসন মেজে স্নান করে স্বামীর জন্য রান্না চাপিয়ে দিলে—স্বামী বিভূতি এসে তার খোঁপা খুলে আঁচল টেনে তাকে বিব্রত করে তুললে। এই যে ঘরোয়া ছবির টুকরো...এ-সব মামুলি হয়ে গেছে। এতে নাম কিনতে পারবেন না। এখানে স্বামীর জায়গায় যদি ওর loverকে আনতে পারেন, তাকে পেয়ে নারীর চিত্ত-বৃত্তির আলোচনা-ব্যাপারে বসে গেল কিরণমালা—ওদিকে ভাত ধরে পুড়ে দুর্গন্ধ, সেদিকে কিরণের খেয়াল নেই...তাহলে

এক রকম interest গড়ে ওঠে। অর্থাৎ কি জানেন, স্বামী-স্ত্রী ঘরকর্ণা করচে—এর মধ্যে বৈচিত্র্য নেই, এ তো সব ঘরে ঘরে দেখচে। সাহিত্য তা নিয়ে কারবার করবে না। সাহিত্যে আমরা চাই, যা হয় না, যা ঘটে না, অথচ যা ঘটলে ভারী আরাম বোধ হয়! আর এ নামও চলবে না—কিরণ! নামটা সনাতন যুগ থেকে চলে আসচে। এখন নায়িকার নাম হবে পরাগিনী, কিম্বা—লোটি, জেশ্‌মিনা, কচিকা...অর্থাৎ এমনি নামেই পাঠক-পাঠিকাকে ভুলোতে হবে, যাতে তারা গোড়া থেকেই বুঝবে যে, হ্যাঁ, এ গল্পে বা উপন্যাসে নতুন রকম কিছু পাবো। না হলে সরলা, বিমলা, আশা,কিরণ, মমতা, মায়া—এ-সব নাম একেবারে হলুদ-ছ্যাঁচা হয়ে গেছে, আনাড়ির দল ও-নাম নিয়ে যা-খুশী লিখুক গে। আপনার চেহারা ভালো, লেখার ষ্টাইলও মন্দ নয়—তাই আপনাকে উপদেশ দিতে ভরসা হলো!

মোহিনী কহিল,—কঞ্চিকেই নোয়ানো যায়, বাঁশকে নোয়ানো সম্ভব নয় কি না...

বংশী কহিল,—যেমন বললুম, অমনি ভাবে লিখে উপন্যাস আনতে পারেন, তাহলে মঞ্জরীতে আমরা আদর করে সে লেখা ছাপবো। অর্থাৎ আমরা দলে বেশ strong হতে চাই...মুক্তির বাণী-প্রচারে আমাদের শক্তিও তাহলে দুর্জ্জয় হয়ে উঠবে।

করালী ধীর ভাবে উপদেশ-বাণী শুনিতেছিল, শুনিয়া কহিল,—উনি যে রকম বললেন, সেই ভাবে না হয় চেষ্টা করবেন। তাহলে ও লেখাটা...

বংশী কহিল,—ওটা নিয়েই যান্। কাট্‌কুট্ করে ঐ modern idea ঢোকাতে পারেন, ভালো—না হয় নতুন কিছু লেখবার চেষ্টা করবেন। পরিশ্রম সমানই হবে।

অবনী কহিল,—দেখবো, কি করতে পারি...

কথাটা বলিয়া অবনী অভিবাদন করিল এবং অভিবাদনান্তে 'গ্রামের মেয়ে' উপন্যাস লেখা খাতা হাতে 'মঞ্জরী' অফিস হইতে বিদায় লইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পথের সন্ধান

উৎসাহ যতই মিলুক, মন খারাপ হইয়া গেল। বহু আশা করিয়া বেচারী আসিয়াছিল, লেখাও তার মন্দ নয়...হয়তো মঞ্জরীতে ছাপার জন্য মঞ্জুর হইয়াছে, শুনিবে! কিন্তু বংশী বাবু যা বলিলেন...

কথাটা নেহাৎ মন্দও বলেন নাই! একঘেয়ে মামুলি ছবিতে বা চরিত্রে নাম কেনা সম্ভব নয়। ঐ যে পরাগ বোস্, অনিন্দ্য গুপ্ত...ওরা কেমন দু' একটা লেখা ছাপাইয়াই নাম করিয়াছে! তরুণ-দলের মুখে-মুখে উহাদের নাম! সে শুধু ঐ নূতনত্বের জোরেই না!...নাম যদি না হইল তো লিখিয়া কি ফল! কিন্তু তারা যে-সব চরিত্র লইয়া যে-ধরণের গল্প-উপন্যাস লেখে, তাদের চাল-চলন, রীতি-নীতি অবনীর জানা নাই। সে-রকম প্লটের বা চরিত্রের আইডিয়া পাইতে গেলে কতকগুলা বিলাতী উপন্যাস পড়া প্রয়োজন। থ্যাকারে-ডিকেন্সের নভেলে ও-আইডিয়া মিলিবে না। হালের কতকগুলা বাজে বই চাই...

ডেনিয়েল তার পানে চাহিয়া চক্ষু মুদিল। ভারী সঙ্গীন মুহূর্ত্ত! লেখাটা বেশ জমিয়াছে, বাঃ! পরাগ বোস্‌রা ঠিক এমনি কথাই লেখে! এ বইখানা স্রেফ বাজে লেখকের লেখা! তবু...এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ঘাড়ে যদি বাঙলা নাম বসাইয়া দি? ঘটনা আগাগোড়া ঐ? স্মিথটাকে এক আপিসের কেরাণী করা যাক...আর্টিষ্টকে একজন কবি, নয় সম্পাদক, কিম্বা পি-আর-এস্ পড়িতেছে, খুব বড়লোক? আর উপন্যাসের নাম? 'বিবাহ রসাতলে যাক্' নাম না দিয়া যদি নাম দেওয়া যায়—"দূর করো বিবাহের বন্ধন!" নামটা মস্ত হয়! তা হোক, ভারী catchy কিন্তু!

সহসা কে ডাকিল,—অবনী না?

বই হইতে চোখ তুলিয়া অবনী চাহিয়া দেখে, গিরীন। গিরীনের সঙ্গে...তার বোন নির্ম্মলা...। গিরীন অবনীর প্রতিবেশী বন্ধু। এককালে এক ক্লাশে দুজনে পড়িত।

নির্ম্মলাকে দেখিয়া অবনী বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গিরীন কহিল—বসবি নির্ম্মলা?

নির্ম্মলা বসিল।

অবনী কহিল—হঠাৎ এধারে?

গিরীন কহিল—এসেছিলুম ঐ এম্পায়ারে—একখানা ভালো ফিল্‌ম্ ছিল, তাই দেখতে। তা জায়গা পেলুম না...এই অবধি বলিয়া গিরীন নির্ম্মলার পানে চাহিয়া তাকে দেখাইয়া বলিল,—এঁর জন্যে! ওঁদের সাজ-সজ্জায় এত বিলম্ব হয় যে

দু'ঘণ্টা আগে থেকে আয়োজন সুরু না করলে বায়োস্কোপ দেখা দায়!

নির্ম্মলা কহিল—বাঃ! তুমি আমায় ডাকবা মাত্র আমি তৈরী হয়েচি—ঠিক পনেরো মিনিটে।

গিরীন কহিল—পনেরো মিনিটই বা লাগবে কেন? আমি তো তিন মিনিটে তৈরী হলুম।

নির্ম্মলা কহিল—তোমাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করো না। আমাদের মাথায় একটা উপসর্গ আছে—খোঁপা তৈরী করা চাই—তার উপর তোমাদের একখানা ধুতি আর পাঞ্জাবী হলেই একেবারে সেরা বাবু বনতে পারো। চূড়ান্ত ভদ্র বেশ। আমাদের ভদ্র সমাজে বেরুতে হলে পোষাকটা একটু সভ্য-ভুব্য করা চাই। তোমরাই তো বলো...! নাহলে একটা ব্লাউজ আর একখানা শাড়ীতে সব সময় ভদ্রতা রক্ষা হয় না—এ তো তোমাদেরি মত!

গিরীন কহিল—খদ্দরের শাড়ী-ব্লাউশের কৃপায় আজকাল অনেকখানি বাহুল্য অনায়াসে বর্জ্জন করা যায়!...নয়? কি বলো অবনী?

অবনী এ সংগ্রামে কোনো পক্ষই গ্রহণ করিতে পারিল না—একবার গিরীনের পানে, পরক্ষণে নির্ম্মলার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল মাত্র।

তার বুকের মধ্যে কি যেন একটা তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল। সহসা গিরীন কহিল—ওগুলো কি হে...অবনী?

অবনী কহিল—ও...ছুটো বাজে বিলিতি নভেল...কিনে এনেচি।

গিরীন কহিল—দেখি...

অবনী নভেল ছুখানা গিরীনের হাতে দিল। পাতা উল্টাইয়া গিরীন কহিল—এটার নাম ভারী মজার তো...Down with Marriage!...তা এ কি হবে? হঠাৎ এ বাজে বই পড়া ধরলে যে...

অবনী একবার নির্ম্মলার পানে চাহিল—নিমেষের জন্ম! নির্ম্মলার উৎসুক দৃষ্টি তাদের উপর ন্যস্ত! অবনী কহিল,—এমনি পড়চি—ছু আনায় কিনলুম। ভালো বই তো ঢের পড়েচি। একবার বাজে বই পড়তে পারি কি না, চেষ্টা করে দেখচি!

গিরীন কহিল—না, না। তোমরা লেখক মানুষ—তোমাদের উচিত নয় এ সব বাজে বই পড়া।...অনর্থক সময়ের গলা টিপে হত্যা!...ওটা কি হে...?

অবনীর হাতের খাতার পানে চাহিয়া গিরীন এই প্রশ্ন করিল।

অবনী একটু তাচ্ছল্যের ভরে কহিল—একখানা খাতা...

—কোনো manuscript?

অবনী লজ্জা-বিজড়িত মৃছু হাস্তে কহিল—তাই।

—দেখি।...

গিরীন খাতা লইয়া নির্ম্মলার পানে চাহিয়া কহিল—অবনীর কোনো লেখা পড়েচিস নিমু?...না, তোর আবার বাঙ্লা সাহিত্যে বেজায় অরুচি!

নির্ম্মলা কহিল—ও-কথা বলচো কেন? বাঙ্‌লা সাহিত্যে কবে অরুচি দেখলে? বঙ্কিমবাবু রবিবাবুর বা কোন্ লেখাটা পড়িনি, বলো তো? তবে এখন একজামিন শিয়রে এসে পড়েচে...তার উপর কখানা মাসিকে এমন ছাই-পাঁশ লেখা বেরুচ্ছে যে জানা লেখক ছাড়া নতুন লেখকের লেখা পড়তে ভয় করে।

গিরীন কহিল—অবনী লেখে ভালো। আমাদের ক্লাশে সেকালে একবার প্রতিযোগিতা হয় ছোট গল্পের—অবনী তাতে ফার্ষ্ট প্রাইজ পায়। ওর সে গল্প 'ভারতী'তে ছাপা হয়েচে!... 'ভারতী' তখন সজীব ছিল।...তা এখানা উপন্যাস?

অবনী কহিল,—হাঁ।

গিরীন কহিল—নাম দেখচি, "গ্রামের মেয়ে"। তা এ গ্রামের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ময়দানে হাওয়া খেতে বেরিয়েচো যে! কথাটা বলিয়া সে হাসিল।

অবনী কহিল—তা নয়।...মানে, একখানা মাসিকের সম্পাদককে দিয়ে ছিলুম—ছাপানোর জন্য। তাদের পছন্দ হলো না—তারা ফেরত দিয়ে বল্‌লে,—এ নাম আজ-কাল চলবে না...

গিরীন কহিল—তা বটে! এখন চাই শুধু "চিত্ত-বনের চকোর," "হৃদয়-দুর্গের বন্দিনী"! ছ্যাখো না, মাসিক-পত্রের পাতা খুলে! এই সেদিন দেখি, একটা লেখা বেরিয়েচে, গল্প—তার নাম "ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ঘর-ছাড়া রূপসী তরুণী।" বাপ্—নাম শুনলে ভয়ে প্রাণ ছমছমিয়ে ওঠে, তা সে গল্প পড়বো কি!...গিরীনের স্বরে রাজ্যের শ্লেষ!

ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে নির্ম্মলা কহিল—দেখি না খাতাখানা...

নির্ম্মলা খাতা লইয়া তার পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। সার্থকতার আনন্দে অবনীর বুক ভরিয়া উঠিল। নির্ম্মলা পাতা উলটাইতে উলটাইতে শেষে একটা পাতায় মন ঢালিয়া দিল, এবং নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতে সুরু করিল।

গিরীন কহিল—দাঁড়িয়ে কেন হে? বসো...তোমাদের সাহিত্য সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা যাক্...নির্ম্মলার বেশ literary taste আছে...

আলোচনা চলিল, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য লইয়া। ঐ সব কুরুচিকর বিশ্রী গল্প—ঐ যে বস্তী-সাহিত্য গড়িয়া একটা নূতন হাওয়ার সঞ্চার! ইহাতে কার কি লাভ? কি উপকার? বস্তীর রিফর্ম্ম চাও? সে কি ঐ বস্তীর মেয়ে ধরিয়া নির্বিচারে প্রণয়-চর্চ্চার দ্বারা সম্ভব না কি? মায়া, মমতা, দয়া—এ সব বৃত্তিগুলার চুলের টিকিও তো দেখা যায় না! শুধু জঘন্য রূপ-বর্ণনা, আর বিশ্রী ইতর কতকগুলা ইঙ্গিত! গিরীন খুব জোরালো প্রতিবাদ তুলিল। সে কহিল—গল্প-উপন্যাসে tone হবে উঁচু। পতিতা বা বদমায়েসের চরিত্র আঁকো—কিন্তু তাদের glowing করে তোলা চলে না। তাদের আদর্শ সমাজে ধরার মানে কি? তাদের দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ, স্নেহ-মায়া—এ-সবে দরদ জাগাতে—আঁকো! তা না, মদ খেয়ে নাচানাচি, মাতামাতি করচে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা মাতালের ভালো লাগতে পারে—ভদ্রলোকের কাছে তা বিষের মত বোধ হয়।...বেড়াতে

মানুষ বার হয় বিশুদ্ধ নির্ম্মল বায়ু-সেবনে—বস্তীর পাঁকের দুর্গন্ধ নেবার জন্য নয়! সে-বস্তুটা রীতিমত অস্বাস্থ্যকর—শরীরের পক্ষে, মনের পক্ষেও। আর্টিষ্ট তো মিউনিসিপালিটির কনসার্ভেন্সি-জমাদার নয় যে পাঁক তুলে বেড়াবে!

এমনি খাপ-ছাড়া মন্তব্য অনর্গল চালাইয়া গিরীন এক সময় থামিল। অবনী কাঠ হইয়া বসিয়া তার মন্তব্য শুনিতেছিল—মাঝে মাঝে মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিল। এবং তার ব্যগ্র দৃষ্টি নির্ম্মলাকে অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করিতেছিল, নির্ম্মলা বেশ মনোযোগ দিয়া গ্রামের মেয়ে পড়িতেছে।...

হঠাৎ নির্ম্মলার পানে চাহিয়া গিরীন কহিল,—তুই যে পড়চিস রে—manuscript! নভেল ছাপা হলে একটা খদ্দের কমবে...ওর লোকসান করিস্ কেন?

নির্ম্মলা কহিল—সবটা পড়চি না তো! এমনি দু'-চার পাতা উল্টে দেখচি।

অবনী কহিল—ও উপন্যাস মঞ্জরী-ওয়ালারা মঞ্জুর করে নি!

নির্ম্মলা একবার চোখ তুলিয়া চাহিল। চাহিতে অবনীর আনন্দ-প্রদীপ্ত দৃষ্টির সহিত তার দৃষ্টি মিলিল।

গিরীন কহিল—নিমু' এবার বি-এ দিচ্ছে। Literatureএ ওর বেশ জ্ঞান! আলাপ করিয়ে দি। ইনি অবনী সেন, বি-এ সাহিত্যিক। আর ইনি শ্রীমতী...নির্ম্মলা আমার খুড়তুতো বোন্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গল্পের প্লট

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া অবনীর মনে এতটুকু স্বস্তি রহিল না। বড় আশা করিয়া মঞ্জরী-অফিসে গিয়াছিল—লেখা তার মঞ্জুর হইবে না, এ-চিন্তা মনের কোণেও উদয় হয় নাই। তার লেখার ষ্টাইলের সুখ্যাতি বন্ধু-বান্ধবে করিয়া থাকে। দু-একখানা মাসিকে তার দু-একটা ছোট গল্পও ছাপা হইয়াছে; কিন্তু ছোট গল্পের আদর কম,—ছোট গল্পের বই নাকি পাব্লিশাররা সহজে ছাপিতে রাজী হয় না—তার উপর বড় উপন্যাসে খ্যাতি-লাভের সম্ভাবনা সব-চেয়ে বেশী। একখানা দুশো-আড়াইশো পাতার নভেল ছাপাইতে পারিলে লোকে পড়িয়া বলিবে, একখানা এত বড় উপন্যাস লিখিয়া ফেলিয়াছে—নভেলিষ্ট! বাঃ!

এই নভেলিষ্টের খ্যাতি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। চাকরি-বাকরির সন্ধানে বাহির হইবার বিশেষ হেতু ছিল না। অবনীর বাপ ছিলেন ডাক্তার,—দু'পয়সা রাখিয়া গিয়াছেন। একটি বোন্—বাপ তার বিবাহ দিয়া গিয়াছেন, যোগ্য পাত্রেই।

গৃহে বিধবা মা, আর পিশি। সে আইন পড়িতে গিয়াছিল, কিন্তু মক্কেলের উপর জুলুম-জবরদস্তি করিয়া পয়সা-উপার্জ্জন—যে মামলা দুর্ব্বল, তাহাতেও স্তোক-বাক্যে মক্কেলকে আশা দিতে হইবে—এ-সব কাজে তার রুচি নাই। ডাক্তারীর দিকে তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। প্রথম তো মেডিকেল কলেজে বাসি পচা মড়ার গায়ে ছুরি চালানো, তার উপর রাজ্যের রোগ-বালাই লইয়া কারবার—সে কথা ভাবিতে তার অঙ্গ হিম হইয়া আসিত। প্রোফেসারী ছিল নির্ব্বিবাদ চাকরি। কিন্তু মাহিনা কম। তার উপর সাহিত্যের নেশা ঘাড়ে এমন জোরে চাপিয়া বসিল যে চাকরি-বাকরির প্রবৃত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। পরে কখনো কোনো ব্যবসা যদি খোলা যায়—এই সাহিত্যের ব্যবসা—মাসিক-পত্র, নয়তো মস্ত পাব্লিশিং হাউস, কিম্বা ছাপাখানা! কিন্তু সে পরের কথা। আগে নভেল লিখিয়া বাজারে একটু খ্যাতি-প্রতিপত্তি মিলুক... বয়স তো আর পলাইয়া যাইতেছে না! তাছাড়া সব কাজে শিক্ষার প্রয়োজন, একটা অভিজ্ঞতা...

মঞ্জরীর বল্লভ কোম্পানির কাছ হইতে হিতোপদেশ ও নৈরাশ্য লাভ করিয়া অবধি সে যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! এমন উপন্যাস ছাপিতে রাজী হইল না? বইয়ের নাম দেখিয়া পড়ার প্রবৃত্তি হইল না! এত বড় ওস্তাদ—এমন অহঙ্কার! মনে করিলে কি সে একখানা কাগজ বাহির করিতে পারে না? পারে ...কিন্তু কাগজ বাহির করিতে গেলে সেই ব্যাপারে এতখানি

ব্যস্ত থাকিতে হইবে—পরের লেখা দেখিতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবে। নিজে লিখিবে কখন্? তাই না, সে মাসিক-পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প প্রাণপণে দাবিয়া রাখিয়াছে!

Sex লইয়া লেখা চাই।...কিন্তু কি লিখিবে?

সামনে জানলা খোলা ছিল। জ্যোৎস্না রাত্রি। খোলা জানলা দিয়া যতদূর দেখা যায়, ঐ সব প্রতিবেশীর গৃহ। ছেলেবেলা হইতে ঐ সব গৃহ সে দেখিয়া আসিতেছে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—কঠিন রোগ, তার চিকিৎসা,—ক্বচিৎ দুটা কলরব-কোলাহল—ইহারি স্পর্শে কখনো দুলিয়া, কখনো শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়া ঐ-সব গৃহ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটাইয়া চলিয়াছে! ছেলে-মেয়েরা ডাগর হইতেছে। চার বছর আগে যে-মেয়েটি ছাদের কোণে দাঁড়াইয়া লুকাইয়া কুলের আচার খাইতে পাইলেই মহাখুশী হইত, আজ সে হয়তো শিশু-কোলে মা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চিরন্তন ধারায় সংসার বহিয়া চলিয়াছে। ইহার মধ্যে Sexএর জটিলতা কোথায়?

না থাকুক, তবু তো উহারা লিখিতেছে—ঐ গুপ্তর দল। একখানা পুরানো মঞ্জরী টানিয়া অবনী তার পাতা উল্টাইতে লাগিল। এই যে পরাগ বোসের লেখা গল্প,—পাঁচিলের ধারে। অবনী মনোযোগ দিয়া গল্পটা পড়িতে সুরু করিল।...

মাধবী বড়লোকের মেয়ে। তার বিবাহ হইয়াছে বেশ বড় ঘরে। স্বামী আনন্দনাথ এম-এ পাশ করিয়াছে। লেখাপড়ায় তার খুব ঝোঁক। মাধবীর মন হাল্‌কা আমোদ চায়...স্বামী

আর তার মাঝখানে বইয়ের আড়াল। মাধবী ভাবে, কি করিয়া ঐ আড়াল ভাঙ্গিবে। গৃহে ছিল আনন্দর মোসাহেব-গোছ দূর সম্পর্কের এক ভাই হাবুল। সে এ্যামেচার-থিয়েটার করিয়া বেড়ায়; বাহিরে কাহারো অসুখ-বিসুখ হইলে পরিচর্য্যায় ছোটে—পড়াশুনায় তার রুচি নাই। বাড়ীতে সকলের কাছে তার পরিচয়, লক্ষ্মীছাড়া। সে একদিন পথ হইতে এক ভিখারীর মেয়েকে কুড়াইয়া আনিল। তার হইয়াছে বসন্ত রোগ, পথে পড়িয়াছিল। হাবুলের প্রাণে মমতা জাগে, তাই—

বাড়ীর লোক একেবারে মার্‌-মার্‌ করিয়া উঠিল। এ কি বেয়াড়া সখ! নিজের হয় না ঠাঁই, আবার শঙ্করাকে ডাকে! রোগ হইয়াছে, বেশ, তাকে হাসপাতালে দাও! হাবুল কহিল—কেউ না দেখে, আমি ওকে দেখবো। আমার যে বিছানা আছে, তাতেই...

হাবুলের মা বলিল—ওরে সব্বনেশে ছেলে, ও যে ছোঁয়াচে রোগ।

হাবুল কহিল—আমারো তো এ রোগ হতে পারে, মা।

হাবুল কারো কথা শুনিল না—সেই ভিখারীর মেয়েকে বুকে তুলিয়া নিজের বিছানায় তাকে শোয়াইয়া দিল। তার পর সেবা।

মাধবীর অন্তরে বিদ্রোহের যে-সুর থাকিয়া থাকিয়া নাচিতেছিল, সে সুর আজ প্রলয়-নাদে পূর্ণ হইল। সে ছুটিল গভীর রাত্রে স্বামীর শয্যা ছাড়িয়া, হাবুল কি করিতেছে দেখিবার জন্য।

আনন্দ কহিল—কোথা যাও?

মাধবী কহিল—হাবুল ঠাকুরপোর সেবায় সাহায্য করতে...

আনন্দ কহিল—তুমি ক্ষেপেচো মাধবী! সে বসন্ত রোগী। হতভাগা হাবলো...

মাধবী কহিল—সে লেখাপড়া শেখেনি তোমার মত—তাই হতভাগার মত বুদ্ধি, জানি!

মাধবী ছুটিল হাবুলের ঘরে। হাবুলও জ্বরে পড়িয়াছে। সেই জ্বরে রোগীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া আছে। চোখের দৃষ্টি পলক-হীন।

মাধবী কহিল—আমায় ভাগ দাও সেবার...

হাবুল কহিল—কার সেবা বোঠান? স্বর্গের জ্যোতি স্বর্গে মিশে গেছে!...বাহিরের জ্যোৎস্নায় জোয়ার দেখচো? এ তার জ্যোতিস্পর্শে!

মাধবী কহিল—মারা গেছে?

হাবুল কহিল,—তাই। কঠিন ধরণী...

মাধবী কহিল—তুমি ওকে ছাড়ো....

হাবুল কহিল—ছাড়বো। কিন্তু মানুষ এমন নীচ! পয়সা নেয় মড়ার কাছেও—নাহলে পোড়াবার কাঠ দেবে না, চুলী ছাড়বে না, তাই ভাবচি।

মাধবী হাতের চুড়ি খুলিয়া দিল, কহিল,—এই নাও। এতে হবে না?

হাবুল কহিল—তুমি দীর্ঘজীবী হও বোঠান—গরীব তোমার আশ্রয়ে আজ পুড়ে বাঁচুক!

তারপর?...

তারপর হাবুলের দেখা নাই—সারাদিন! মাধবীর মনে অস্বস্তি! গান, বাজনা, নভেল, কবিতা...কিছু ভালো লাগে না! সারাদিন পথের পানে চাহিয়া সে জানলার ধারে বসিয়া আছে। সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল। বই-পত্র বন্ধ করিয়া আনন্দ শুইতে আসিল; মাধবীকে কহিল,—তুমি শোবে না?

মাধবী কহিল—না। একটা মানুষ কোথায় গেল মড়া নিয়ে—ফিরলো না! তার খপর না নিয়ে পণ্ডিতের দল নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারে, আমি পারি না।

হাসিয়া আনন্দ কহিল—তুমি পাগল!

মাধবী কহিল—তাই।

আনন্দ শুইতে গেল। মাধবী তেমনি নিঝুম বসিয়া রহিল, পথের পানে চাহিয়া সেই জানলার ধারে।

পথে লোক-চলাচল বন্ধ হইল। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটিল। সদরের ভারী ফটক কখন্ বন্ধ হইল। কোথাও কেহ নাই! চারিদিক স্তব্ধ..!

সহসা...ও কে? ঐ? টলিতে টলিতে পড়িতে পড়িতে আসে? এই দিকে?

মাধবী শিহরিয়া উঠিল।...হাঁ, সেই...ঐ যে দ্বারে করাঘাত! ...ঐ কে ডাকে,—শিবু...

শিবু বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য। কেহ উঠিল না—সাড়া দিল না। দ্বার তেমনি বন্ধ।

মাধবী যেন কাঠ! চোখের দৃষ্টি দ্বারপ্রান্তে। লোকটা?... ও কে? ও যে দ্বার ধরিয়া বসিয়া পড়িল। হাবুল ঠাকুরপো! মাধবীর সমস্ত মন তাতিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর ধরণী! সে দ্রুত নামিয়া গেল, সবলে বড় ফটক খুলিয়া ফেলিল, হাবুলের দেহ তখন পথে লুটাইয়া পড়িতেছে...

মাধবী তাকে বুকে টানিয়া লইল, গদগদ কণ্ঠে কহিল—জীবনে কখনো কারো ভালোবাসা পাওনি...তাই এ অভিমান? না। আমি তোমায় চিনেছি। এই জ্যোৎস্না-রাত...চলো, নিভৃত নিকুঞ্জে...আমরা প্রেমের সংসার পাতবো।

হাবুল একবার চোখ মেলিয়া চাহিল—চোখ লাল টক্‌টক্ করিতেছে! হাবুল ডাকিল,—বোঠান...

একটা দুর্গন্ধ! হাবুল মদ খাইয়াছে। হাবুল কহিল,—কিন্তু আমি মাতাল...

মাধবী কহিল,—মদ খেয়েচো! ও-মদের নেশা কতক্ষণ! কিন্তু এরা...এই সাধু পণ্ডিতের দল? দর্পের মদে মাতাল। এদের নেশা ছুটবে না। এখানে তোমার ঠাঁই নেই, আমারো না!

গল্প এইখানে শেষ!

পড়িয়া রাগে অবনী কাগজখানা দূরে ফেলিয়া দিল। এই রকম যা-তা লেখে...অথচ এরই এত নাম! এই সব লেখা

ছাপিতে ঐ সব হতভাগা কাগজগুলা যেন হাঁ করিয়া আছে! কি এ লেখার অর্থ? কি বলিতে চায় ঐ পরাগ বোস্ এ লেখা ছাপাইয়া!

মাধবী ঘরের বধূ...তার কিসের অভাব? স্বামীর দোষ কোথাও নাই...পড়াশুনা করে। এই অপরাধে তার কুলে কালি দিয়া স্ত্রী পলাইতেছে ঐ হতভাগার সঙ্গে! তাও কি চরিত্র-সৃষ্টি! পথে হঠাৎ এক ভিখারীর মেয়ের উপর মমতা জাগিয়া গেল এমন—যে, কাণ্ড-জ্ঞান হারাইয়া তাকে ঘরে আনিয়া হাজির! তারপর ঐ মাধবী...দুম্ করিয়া নামিয়া গিয়া একেবারে রোমান্টিক বক্তৃতা...চলো, ঘর ছাড়িয়া যাই! ভদ্র-ঘরের মেয়ের এমন প্রবৃত্তির কথা ভদ্র লোকে লেখে কি করিয়া? নারী জাতির প্রতি এত-বড় অপমান!...মাধবীর মনে এত যদি মায়া, ডাক্তার ডাকাইল না কেন, মেয়েটা যখন বাঁচিয়া ছিল, তখন? কুলে কালি না দিলে বুঝি প্রাণের মহত্ত্ব দেখানো যায় না? ইহারি নাম ঘটনা-সৃষ্টি! বেকুব! গাধা!

হায়রে, মঞ্জরীর দল উপদেশ দিয়াছে, অমনি উপন্যাস লেখা চাই—নহিলে নাম হইবে না! সাহিত্য-জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না!...

সাহিত্য-জগৎ মানে কি মঞ্জরী-অফিস? বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—তাঁদের মাথা হেঁট হয় নাই তো—এমন লেখার কল্পনাও তাঁরা করেন নাই! আর ঐ সব দিগ্‌গজ নভেলিষ্টের দল...মাথা তাদের আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে, বটে!

অবনী ভাবিল, কাজ নাই মঞ্জরীর খোসামোদে! এ উপন্যাস নিজেই পয়সা খরচ করিয়া ছাপাইব। দেখি, আদর মিলে কি না!...পরাগ বোসের দল ছাড়া আরো বহু লেখক অমন Sex-তত্ত্ব না লিখিয়াও খ্যাতি পাইয়াছেন। তবে?...

সকালে উঠিয়া চা পান করিয়া অবনী ভাবিতেছিল, এখন কি করে? এমন সময় গিরীন আসিয়া উপস্থিত। অবনী কহিল—এসো...

গিরীন কহিল—ওহে, তোমার লেখা সেই উপন্যাসের খাতাখানি আজ একদিনের জন্য দিতে হবে।

অবনী সবিস্ময়ে গিরীনের পানে চাহিল। গিরীন কহিল—মানে, নিমু গিয়ে বাড়ীতে রিপোর্ট দেছে—আমার নবোঢ়া কামিনী...লাইব্রেরীর বই দু'বেলা জুগিয়েও তাঁর পড়ার নেশা মেটাতে পারি না। তিনিও ও-বই পড়বেন। তাছাড়া নিমুকে তিনি তিরস্কার করে বললেন,—সে খাতা ফেরত দিলে কেন? নিয়ে আসতে পারলে না?...নিমু তোমার লেখার সুখ্যাতি করছিল গিয়ে...

অবনীর বুক পুলকে স্পন্দিত হইল। খাতা বাহির করিবামাত্র পথে এমন ভক্ত পাঠক মিলিয়াছে!

গিরীন কহিল,—মানে, নিমু বললে, লেখা ভালো। গল্প যেটুকু পড়েছিল, তাতে রস আছে, interest আছে...তা খাতাখানি দাও একবার! ভয় নেই হে, লোপাট হবে না। আমি পড়বো না, কথা দিচ্ছি।

অবনী কহিল—কি যে বলো!...বেশ, খাতা এনে দিচ্ছি। চা খাবে?

গিরীন কহিল,—না। তুমি বাড়ীতে চা শেষ না করলে আমার ওখানে এই দণ্ডে তোমায় নিয়ে যেতুম। সে রকম আদেশও আমার উপর ছিল। তা যাক, অতদূর পীড়ন করবো না। তুমি আপাততঃ খাতাখানি দাও...তোমায় বন্দী করবো না।

হাসিয়া অবনী উঠিল এবং দোতলার ঘর হইতে গ্রামের মেয়ে উপন্যাস-লেখা খাতাখানি আনিয়া গিরীনের হাতে দিল। খাতা লইয়া গিরীন উঠিল, কহিল—তাহলে আসি, ভাই।...খাতা কালই ফেরত পাবে।...খাতার সম্বন্ধে মনে কোনো রকম দুশ্চিন্তা পোষণ করো না।

গিরীন চলিয়া গেলে অবনী আবার আকাশের পানে দুই চোখের দৃষ্টি মেলিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। যে-লেখা পড়িয়া মঞ্জরীর দল তাকে উপদেশ দিল, এ-লেখা এ-যুগে চলিবে না, দেশের হাওয়ায় গা ভাসানো চাই,...সেই লেখার একটু নমুনাই গিরীনের বোন্ শ্রীমতী নির্ম্মলার ভালো লাগিয়াছে।...তবে? নির্ম্মলা সাহিত্যের কি খবর রাখে? মঞ্জরী-ওয়ালারা সাহিত্যের কারবারী। মন নিরুৎসাহে কুণ্ঠিত হইল। পরক্ষণে মনে হইল, তা কেন! পাঠক-সমাজ তো ঐ নির্ম্মলা এবং তার মত নর-নারী লইয়া! তা ছাড়া নির্ম্মলা ফ্যাল্না পাঠিকা নয়। এবার বি-এ পরীক্ষা দিতেছে! তবে? পাঠক-পাঠিকার জন্যই তো

লেখা। কোনো বিশেষ কাগজের সম্পাদক বা লেখক-লেখিকার সে লেখা ভালো লাগিল কি না, সেদিকে নাই বা লক্ষ্য রাখিল! ...মন আবার বলিল, কিন্তু এরা কথায় কথায় কন্‌টিনেণ্টাল লেখকদের নজীর তোলে! ইহাদের পাণ্ডিত্যের কোনো সীমা নাই! উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির সম্বন্ধে এমন সব নূতন নূতন কথা বলে যে শুনিয়া তাক্ লাগিয়া যায়! বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের কাছেও যে-সব তত্ত্ব শুনা যায় নাই, এমন বহু তত্ত্ব লইয়া মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লেখে...সে সব প্রবন্ধের অর্থ আগাগোড়া সে বুঝিতে পারে না। বাঙলা ভাষায় লেখা হইলেও সে লেখা এমন দুর্ব্বোধ ব্যাপার, এতখানি জটিলতা সে-গবেষণায়! বাঙলায় লেখা হইলেও যখন তার অর্থবোধ দুষ্কর, তখন এটুকু মানিতে হইবে, যে তার মধ্যে দার্শনিকতা আর জ্ঞানের মাত্রা অত্যধিক! এবং ঐ সব লেখার সম্বন্ধে করাচি, হীরাট, কাবুল হইতেও প্রবাসী বাঙালী পত্রচ্ছলে এমন সব মন্তব্য লিখিয়া কাগজে ছাপিতে পাঠায়, যে-সব মন্তব্য আসল প্রবন্ধের চেয়েও কঠিন, দুর্ব্বোধ! যাদের লেখা লইয়া এত আলোচনা, এমন আস্ফালন চলে, সত্যই তাদের উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাদের লেখা অবনীর কাছে যত দুর্ব্বোধ ঠেকে, ততই তাদের প্রতিভাকে সে শ্রদ্ধা করিয়া চলে! রবীন্দ্রনাথ কোথায় সেই বলিয়াছেন—যত তোরে নাহি বুঝি, তত ভালোবাসি!

অবনী ভাবে, দুর্ব্বোধকে ভালোবাসা বুঝি ধরণীর ধারা! নহিলে শক্তির বা প্রতিভার আদর হইত কি করিয়া? তার মনে

পড়িল, তাই তো, সেই ইংরাজী উপন্যাস দুখানা! Down with Marriage বইখানার প্রায় অর্দ্ধেকটা পড়া হইয়াছে...সে বইখানা শেষ করিয়া দেখা যাক্ বাঙলায় নাম বদ্‌লাইয়া চালাইয়া দেওয়া যায় কি না! শুধু ইংরাজী নামগুলাকে বাঙলায় রূপান্তরিত করা। পরাগ বোস্‌দের লেখা সে পড়িয়াছে—সে সব লেখায় পাত্র-পাত্রীদের নামগুলাই যা বাঙালী, আর কথাবার্ত্তা বাঙলায় লেখা, নচেৎ তাদের আচার-ব্যবহার কাজ প্রভৃতি...সব হুবহু বিলাতী! পলাশডাঙ্গার জায়গায় লিশ্‌বন্ বা ডাণ্ডি, এবং শোভনার জায়গায় আগ্‌নেশ্ করিয়া দিলেই বিলাতী নভেল বনিয়া ওঠে! ঐ যে গল্পটা—বাঙালীর মেয়ে একা ট্রেনে চড়িয়া কোথায় কতদূরে পাড়ি দিতেছে—পথে অজানা তরুণের সঙ্গে কি সহজে অন্তরঙ্গতা ঘটিল। তারপর দুম্ করিয়া কোথাকার একটা ষ্টেশনে দু'জনে নামিয়া পড়িল। ট্রেনের কামরা হইতে অজানা তরুণ সহযাত্রীকে আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে পাক্‌ড়াও করিল! তরুণ বেচারা হাঁ করিয়া আছে! সে হয়তো রুগ্না মার কাছ হইতে টেলিগ্রাম পাইয়া কাশীতে কি লাহোরে চলিয়াছে—তরুণীর বিহ্বল-করা চাহনির চটুল মোহে প্রাণে স্বপ্নের মায়া বুনিতে সুরু করিয়া দিল! তরুণীর টানাটানিতে তরুণ নিষেধ তুলিয়া বলিল,—কিন্তু আমার মার অসুখ। কাশী থেকে তার পেয়েচি। তরুণী সে নিষেধ হাসিতে চূর্ণ করিয়া কহিল,—এ-বয়সে মা! এমন বসন্ত! ঐ মুক্তির হাওয়া! আমি আকুল গো! নাহলে আমার এখানে নামবার কি দরকার

আছে ? কলেজের ছুটীতে প্রাণটা একেবারে উদাস পড়েছিল—হঠাৎ জব্বলপুর থেকে উষ্কার চিঠি পেলুম। সে লিখেচে, বিলেত থেকে তার দাদা ফিরেচে, যেন একটি জড়-ভরত...দেখবার জন্য তাই সেখানে ছুটেছিলুম। এই জব্বলপুরের টিকিট। তারপর এখানে নামচি...কেন ? ঐ মাঠ, রোদে-চোঁয়া ধূ-ধূ মাঠ...ওর আহ্বান এসেচে! চলো বন্ধু। ট্রেনের কামরায় তিন ঘণ্টার আলাপ, তবু আমার মনে হচ্ছে, যেন যুগযুগান্তের এক মস্ত অভিসন্ধির ফল এ! ধরণীর প্রথম স্থষ্টির দিনে যখন আর কোনো নর-নারীর চিহ্নও ছিল না, তখন এই ধরণীর বুকে আমরা ছিলুম, তুমি একমাত্র তরুণ নর, আমি একমাত্র তরুণী নারী! চলো, ঐ ধূ-ধূ প্রান্তরে...দেখি, অন্তরের পিপাসা মেটে কি না...

ব্যস! অমনি এক ইসারায় তরুণ যাত্রীকে লইয়া তরুণী চলিল অভিসারে।

এ গল্প গত মাসের 'ভাঙ্গনে' ছাপা হইয়াছে...অনিন্দ্য গুপ্তর লেখা। 'ভাঙ্গনের' দলটা বেশ বড়। তাদের দলে ফেল-করা দু'জন ঘাগী আছে—দুটী উপাধি-ধারীর আমদানিও হইয়াছে। এবং তাদের কি দম্ভ আর আস্ফালন! রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া রসাতলে পাঠায়! তাদের মতে শ্রীযুক্ত গন্ধমাদন চক্রবর্ত্তীই বাঙলার একমাত্র লেখক। গন্ধমাদনের গুণ কত! কবিতা লেখে, গল্প লেখে, উপন্যাস লেখে; তাছাড়া সামাজিক, সাহিত্যিক আলোচনা, পলিটিক্যাল টিপ্পনী...ভাঙ্গনের দল বলে, ষোল বৎসর বয়সে গন্ধমাদনের টাইফয়েড হয়—রোগ

সাংঘাতিক। সে রোগ সারিলে বন্ধু গন্ধমাদন বর্ণমালা-ব্যাকরণ প্রভৃতি সব ভুলিয়া যায়। আবার এ বয়সে পাকা ঘুঁটি কাঁচাইতে বসা—পড়াশুনা?...গন্ধমাদনের ভালো লাগিল না। অথচ লোকালয়ে থাকিতে গেলে...কাজেই গন্ধমাদন পরিব্রাজকের বেশে দেশ ত্যাগ করিয়া যায়...এবং দীর্ঘ বারো বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া এই 'ভাঙ্গন' কাগজ খুলিয়া বসিয়াছে! দল জুটিয়া গেছে চট্ করিয়া। পরীক্ষা, চাকরি প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিয়া যারা কোন রকম সুবিধা করিতে পারে নাই, তারা এখানে এই ভাঙ্গনের চারিধারে বিরাট আশ্রয় গড়িয়া তুলিয়াছে। তারাই বলে, গন্ধমাদন যে দেশে ফিরিয়াছেন শ্রীগন্ধমাদন হইয়া, এ শুধু বাণীর প্রত্যাদেশে। পরিব্রাজক-বেশে গন্ধমাদন হিমালয়ের কোন্ প্রান্তে দৈব-বশে গিয়া হাজির হয়—সেখানে প্রচণ্ড তুষার-পাতে গন্ধমাদন সঙ্গীত-সাধনায় রত হইলে দেবী বাগীশ্বরী আসিয়া তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন্! দেবী তাঁর সঙ্গীতে সম্মোহিত হইয়া বীণাখানি তাঁকে দান করেন। পরে পিনাকপাণি বাগীশ্বরীকে ভর্ৎসনা করেন,—কেন? বাগীশ্বরী কহিলেন—খুশী। ইহাতে বাক-বিতণ্ডা ওঠে এবং রুদ্র ভৈরবের আদেশে তাঁর দুষ্ট বলদ বীণাখানিকে চূর্ণ করিয়া দেয়। তবে গন্ধমাদন ছাড়িবার পাত্র নয়—বলদের শিং খানিকটা ভাঙ্গিয়া আনিয়াছে। সেই শিঙের প্রসাদে সমালোচনায় একেবারে বলদ-তুল্য শক্তি দেখাইতেছে। পরকে গুঁতাইবার বিদ্যা এই জন্যই...অর্থাৎ...এ একেবারে দৈব শক্তি!...সেই

শ্রীগন্ধমাদনের সম্পাদিত পত্র 'ভাঙ্গনে' অনিন্দ্য গুপ্তর ঐ লেখা বাহির হইয়াছে। তাদের দল বলে, এ লেখার তর্জ্জমা করিবার জন্য ফ্রান্স, জার্ম্মানি, রাশিয়া হইতে নাকি বিস্তর অনুরোধ-পত্র আসিয়াছে। কে জানে, হয়তো ঐ এক গল্পের জোরেই এবারকার নোবেল্ প্রাইজ শ্রীমান্ অনিন্দ্য গুপ্তর ভাগ্যে...

চারিদিকে সমস্যা...অবনী সমস্যার পাথারে যেন চুবন খাইয়া ফিরিতেছিল। চিন্তার কি কোনো সীমা আছে! অথচ চিন্তা করিয়াও এ সমস্যা সমাধানের উপায় মিলে না—মাঝে হইতে সমস্যা বাড়িয়া চলে!

চিন্তা ছাড়িয়া সে Down with Marriage উপন্যাস খুলিয়া বসিল। এ বইটা পড়িয়া শেষ করিতে হইবে, তার পূর্ব্বে আর চিন্তার তরঙ্গে গা ভাসাইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বর্গের সিঁড়ি

উপন্যাস দুখানা দু'দিনে পড়িয়া সে শেষ করিল। তারপর খাতা পাড়িয়া লিখিতে বসিল,—দূর করো বিবাহের বন্ধন উপন্যাস। প্লট হুবহু গ্রহণ করিল না। যা গড়িয়া লইল, তার তাৎপর্য্য এই,—সহরের বুকে এক বস্তী। সেই বস্তীতে আর পাঁচ ঘরের সঙ্গে একখানা ঘর লইয়া থাকে সাধু দাস। সাধু কোন্ বড় ফার্ম্মে হেড মিস্ত্রীর কাজ করে, মাহিনা পায় ষাট টাকা। সাধুর স্ত্রী মেখলা। মেখলা তরুণী এবং পরমা সুন্দরী। সাধু কাজ করে, মদ খায় এবং মেখলাকে খুব মার-ধর করে। মেখলার রূপের পূজায় নিজে কখনো তন্ময় হয় না। এ রূপের সে আদরও করে না। আদর না করুক, ঐ রূপের জন্যই তার মনে নিত্য সংশয়। মেখলাকে বস্তীর বারোয়ারি-কল হইতে জল আনিতে হয়; দোকানে গিয়া এটা-ওটা কিনিয়া আনা, তাতেও মেখলাকে ছুটিতে হয়, অথচ তা লইয়া সাধুর গায়ের জ্বালার অন্ত নাই। মদ খাইয়া আসিয়া কোনোদিন সে মেখলাকে বলে,—মুদির

ছোট ভাইয়ের সঙ্গে অত হেসে তোর কি কথা হচ্ছিল? কল-তলায় সরকার-বাড়ীর চাকরের সঙ্গে রঙ্গ না করলে বুঝি চলে না? মেখলা এ-দোষে দোষী নয়, তবু অমনি অছিলায় তার উপর অবিরাম পীড়ন চলে। বস্তীর আর-পাচজন লোক দাঁড়াইয়া মজা দেখে, দেখিয়া হাসে, কোনো দিন মেখলাকে ধরিতে আসে না।

একদিন—সেদিন ছুটী ছিল। মেখলা গিয়াছিল কলতলায় কলসী লইয়া জল আনিতে। কলতলায় ভিড় ছিল। বেচারী কলসী লইয়া একধারে দাঁড়াইয়া আছে, পাড়ার মতি হালদার কলতলায় আসিয়া জুটিয়াছিল স্নান করিতে। মেখলাকে দেখিয়া মতির কি হইল, সেই জানে, ভিড় সরাইয়া মেখলাকে কহিল,—এসো গো, জল নিয়ে যাও। মেখলা ফাঁক পাইতে কলের মুখে কলসী পাতিল; এবং মতিও সহসা নিজের মনে নিধু বাবুর একখানা রসালো গান ধরিয়া সুরের স্বর্গ-যাত্রা-ব্যাপারে মাতিয়া উঠিল। মেখলার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া সাধু আসিয়া কলতলায় দাঁড়াইল। নিমেষে তার পৌরুষ জাগিল, এবং একটি লাথির ঘায়ে মেখলার হাতের কলসী আকাশে তুলিয়া মেখলার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া সবেগে ঠেলা দিল। সে-বেগে মেখলা গিয়া পড়িল পথের উপর। গায়ের কাপড়-চোপড় কোথায় সরিয়া গেল, ঠিক নাই—এবং হুড়মুড় করিয়া অমনি একখানা মোটর আসিয়া উপস্থিত একেবারে মেখলার উপর! মোটরে ছিল এক প্রচণ্ড ধনীর তরুণ বংশধর গোলাপকান্তি।...ড্রাইভার গাড়ী রুখিয়া ফেলিল,—সাধু দৈত্যের মত আসিয়া দাঁড়াইল মেখলার কাছে, হাতে ঘুষি

বাগাইয়া একেবারে রুদ্র-মূর্ত্তিতে! গোলাপ ব্যাপার দেখিয়া মোটর হইতে নামিয়া রঙ্গস্থলে দাঁড়াইল এবং সাধুকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া মেখলাকে বুকে তুলিয়া পথেই বসিল। মেখলার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে—যেন ডালিম ফাটিয়া রঙের বাহার খুলিয়াছে!

সাধু কহিল—আমার পরিবার—আমি যা খুশী তাই করবো। তুমি কে?

গোলাপ কহিল—তোমার যম।...তোমায় পুলিশে দেবো ফের যদি কথা কও।

সাধু কহিল—বড় মানুষ আছো, তুমিই আছো—আমার পরিবারকে এসে বুকে তোলো, এত সাহস তোমার!

গোলাপ কহিল—শুধু বুকে তোলা কি! আমি ওকে গাড়ীতে তুলে হাসপাতালে চললুম। তোমার যা সাধ্য থাকে, করো। মূর্চ্ছা হয়েচে, তা দেখেচো কি? হতভাগা, পাষণ্ড—এমন সুন্দরী তরুণী. স্ত্রী...তার গায়ে হাত তোলো? তোমার শিক্ষার দরকার।

এমনি প্লট গড়িয়া সে দেখে, এ তো ঐ পরাগ বোসদের মত হইতেছে না! মেয়েটাকে বদ করিয়া তোলা চাই। অর্থাৎ সমাজ, সংসার—যা পাইবে, তাকেই কলমের কালিতে কালো করিয়া তোলা চাই। সে পণ করিয়া লিখিতে বসিয়াছে, সাদাকে কালো, কালোকে সাদা, এবং হয়-কে নয় ও নয়-কে হয় করিতে হয় যদি তাহাতে তিলমাত্র হঠিবে না—রচনাটিকে উহাদের ঊর্দ্ধে তুলিয়া তবে ছাড়িবে! তা না করিয়া এ কি লিখিয়াছে!... তাকে বলে,—গ্রামের মেয়ে চলিবে না! উপন্যাস লেখায় সে

যেন ঐ পরাগ বোসদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে! সে কি অমন লেখা লিখিতে পারে না?

দোতলার ঘরে বসিয়া সে লিখিতেছিল, ভৃত্য ছিরু আসিয়া খবর দিল—একটি বাবু এসেচেন।

রাগ ধরিল—কলমের মুখে তখন ভাবের জোয়ার আসিয়াছে। সে জোয়ারে সমাজ-সংসারকে ভাসানো চাই...আর এ সময় বাধার পাহাড় তুলিয়া সামনে আসিল, বাবু! অবনী কহিল—কে বাবু? নতুন কেউ?

ছিরু কহিল,—না। এই যে পাড়াতেই থাকেন...বললেন, ভারী দরকার।

অবনী উঠিল, উঠিয়া নীচে আসিল। আসিয়া দেখে, গিরীন। তার হাতে সেই খাতা।

গিরীন কহিল—এই নাও তোমার গ্রামের মেয়ে। কি করছিলে?

অবনী সস্মিত মুখে কহিল,—লিখছিলুম।

গিরীন কহিল,—উপন্যাস?

—হাঁ। সেই বইখানা থেকে একটা প্লট adapt করেচি—সেইটে লিখছিলুম। যেমন ওরা উপদেশ দিয়েছিল! দেখি, ওদের পরাগ বোস্, অনিন্দ্য গুপ্তদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি কি না!

গিরীন কহিল,—আরে রামচন্দ্র, এ দাস্য সুরু করলে কেন হঠাৎ?

অবনী কহিল,—ওদের একটু দেখিয়ে দিতে চাই,—মনে করলে ও-রকম লেখা আমিও লিখতে পারি।

গিরীন কহিল—ঐখানে ভুল করচো ভাই। ভদ্রলোক চট্ করে অভদ্র হতে পারে না। তুমি ঐ ময়লা-গাড়ী ঠেলতে পারো? ডাষ্ট-বিন্ থেকে কোদালে চেঁছে রাজ্যের দুর্গন্ধ ময়লা আবর্জ্জনা ঝুড়ি ভর্ত্তি করে বয়ে ময়লার গাড়ীতে বোঝাই দিতে পারো?...পাগল! শিক্ষা, সহবৎ...সেগুলো মানুষ বিসর্জ্জন দিতে পারে না। Not for money's sake, even!

হাসিয়া অবনী কহিল,—কেন হবে না? বহু পণ্ডিত ব্যক্তি যে মদ খেয়ে পথে-ঘাটে মাতলামি করে, এবং আরো বিবিধ বদখেয়ালী! আমিও আজ তেমনি মাতাল হয়ে পথে মাতন করতে চাই। ওরা বুঝুক্, মাতলামি করতে শক্তি, সাহস বা প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। শুধু লজ্জা বিসর্জ্জন দেওয়া...

গিরীন কহিল,—লজ্জা-ত্যাগে দুর্দ্দান্ত গোছের সাহস চাই। সে সাহস না থাকলে ভদ্রতা বিসর্জ্জন দিতে পারবে না কস্মিন কালে। কিন্তু ও কথা থাক্—আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে যেতে হচ্ছে। তোমার নিমন্ত্রণ। রাত্রে ঐখানে খাবে।...সাধনার ব্যাঘাত হবে না তো?, আসচো?

হাসিয়া অবনী কহিল,—কি যে বলো! যাবো বৈ কি।

গিরীন কহিল,—আজ নিমুর জন্মদিন...অন্যবার আয়োজনও বিশেষ হয়। তা এবার শিয়রে ওর এগজামিন...তাই নমো-নমো করে সারা হচ্ছে! তোমায় বললুম, আর দু-তিনজনকে

মাত্র বলেচি।...ভিজিটর্স-লিষ্টে তোমার নাম কাল লিখে নেওয়া হয়েচে আমার গৃহিণীর প্রস্তাবে এবং শ্রীমতী নির্ম্মলার সমর্থনে।

কথাটা বলিয়া গিরীন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; তারপর কহিল,—তোমার প্রতিভার আদর হয়েচে হে আমাদের গৃহে।

অবনীর মুখ সস্মিত হইয়া উঠিল—মুখে সে কিছু বলিতে পারিল না।

গিরীন কহিল,—আসি তাহলে। তোমারো ইচ্ছা নয় যে দু' দণ্ড বসি! কেন না উঠানে দাঁড় করিয়েই আলাপ সারচো! কাজেই বিরক্ত করতে চাই না।

অবনী এ কথায় অপ্রতিভ হইল। তার একেবারে হুঁশ ছিল না। সে কহিল,—তা নয়। সত্যি, ছেলেবেলাকার এ অভ্যাস এখনো রয়ে গেছে। যে-কারণ তুমি ইঙ্গিত করলে, সে-কারণ নয়। আদিম বর্ব্বরতা বলো, আর ছেলেমানুষী sporting spiritই বলো! এসো, বসবে।

হাসিয়া গিরীন কহিল—না, না। আমি এখন চলেছি রাত্রের অতিথিদের জন্য রশদ-সংগ্রহে। বসবার অবসর নেই। তুমি যাও বরং, লেখো'গে—তোমার ঐ বস্তীর পাঁক এ-বেলা ঘেঁটে নাও। ও বেলায় ও-পাপ কার্য্য না করতে হয় আর। যেতে হবে এক মজলিসে—সেখানে তোমার ভক্তবৃন্দও থাকবে—ও পাঁকের দুর্গন্ধ গায়ে না লেগে থাকে! বলিয়া আর একবার উচ্চ হাস্য-রোল তুলিয়া গিরীন বিদায় লইল।

গিরীন বিদায় লইলে অবনী উঠানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া

রহিল, স্তব্ধ মৌন ভাবে। গিরীন রঙ্গ করে খুব...কিন্তু রঙ্গ করিয়া যা বলিল, তার মধ্যে সত্য কিছু কি নাই ?...আবার সেই চিন্তা !...

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিল, দূর হোক, চিন্তা করিব না ! পণ যখন করিয়াছি, তখন আর টলি কেন ? যে যাই বলুক, পরাগ বোসদের সঙ্গে পাল্লা দিব—আর কোনো কারণ না থাকুক, শুধু উহাদের দম্ভ চূর্ণ করিতে চাই বলিয়া...

ফিরিয়া আবার সে কলম লইয়া বসিল। কিন্তু খেই হারাইয়াছে ! আকাশের পানে চাহিয়া, ঘরে পায়চারি করিয়া কিছুতেই সে হারানো খেইয়ের সন্ধান মিলিল না। বিরক্ত হইয়া ড্রয়ার টানিয়া সে-খাতা ড্রয়ারে রাখিয়া খপরের কাগজ খুলিয়া বসিল। উপন্যাসের নেশায় ক'দিন খপরের কাগজও সে খুলিয়া দেখে নাই। রাজ্যে কোথায় কি ঘটিয়া গেল...

কোনো খপর নাই। পৃথিবী তার সেই সনাতন চালে চলিয়াছে, নিত্যকার মত। সেই কোথায় পাঁচ সেকেণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছে ; কোন্ লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসব ; মনসাখালি গ্রামে তরুণ ড্রামাটিক ইউনিয়ন 'সাজাহান' প্লে করিয়াছে ;—টেলিগ্রাম-কলমে চীনে অর্থ-সমস্যা ; আমেরিকায় ভারতীয় প্রশ্ন ; পার্লামেণ্টের মেম্বররা চুপ করিয়া আছেন, ভারত-সরকারের রিপোর্ট সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই ; কংগ্রেস-কমিটির কর্ম্মী বলাই সামন্তর পায়ে হুঁচট লাগিয়া বুড়া আঙুলের নখ ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; মার্কণ্ডী দেবীর বক্তৃতা ;—সেই একঘেয়ে বস্তা-পচা মামুলি খবর !

আদালতের কলমে সেই বিশু-মুচি শিউধনীকে চড় মারিয়াছে ; বিশ্বনাথ-কোম্পানির রোয়াক হইতে কুমড়া চুরি করিয়া হানিফ পলাইতে ছিল, কুমড়া-সমেত পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া দেড় মাস শ্রীঘর-বাসে গিয়াছে !...সম্পাদকীয় টিপ্পনীতে সেই আত্মশ্লাঘা আর অপরের গ্লানি-কুৎসা ! কাগজের পাতা উল্টাইল, অমনি একটা পৃষ্ঠায় শিরোনামা নজরে পড়িল, Realism in Bengali Fiction !

সাগ্রহে সে পৃষ্ঠাখানা টানিয়া অবনী তাহাতে মনঃসংযোগ করিল। দেড় কলম এক প্রবন্ধ। প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম-উল্লেখ আছে, তার পরই চট্ করিয়া অনিন্দ্য গুপ্ত, পরাগ বোসের রচনার অজস্র সুখ্যাতি সুরু। অনিন্দ্য গুপ্তর উপন্যাস "বস্তীর পাঁক" বাঙলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে-সার দিয়াছে, সে-সারে স্তবকে-স্তবকে এবার কত পদ্মই না ফুটিবে ! পরাগ বোসের "পচা গলি" বাঙলার কথা-সাহিত্যে পাকা পথ বানাইয়া দিয়াছে ! নির্ভয়ে সেই পথে চলিয়া যাও। সে-পথে ছোরা-ছুরি, পকেট-মারের ফন্দী-ফিকির, কোকেনের পুরিয়া—কি নাই ? কাব্য-ভোলা বাঙালী হুঁশিয়ার হইবে। পকেট-মারকে কেহ আর পুলিশে দিবে না, পকেট বাড়াইয়া দিবে, কারণ গুণ্ডার গৃহে আছে রূপসী সাঁরা, মুন্নার দল। তাদের আবেশ-ভরা চোখ ! বাঙলা সাহিত্যে মেহদী পাতা, হেনা ফুল, বেতের চুবড়ির আমদানী সুরু হইয়া গেল—বাঙালীর কল্পনার ক্ষেত্র ইস্পাহানী মাঠের শোভায় ভরিয়া উঠিতেছে !...উন্মাদের মত একেবারে অর্থহীন

উক্তির সাগর বহিয়া চলিয়াছে! ইংরাজী ভাষাটাকে পর্য্যন্ত লেখক চষিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। প্যারীচরণ সরকারের ফার্ষ্ট বুকের সঙ্গে স্যাম্ জনশন আর গার্ভিস-রাস্কিন মিশাইয়া যে পাঁচন বানানো হইয়াছে, তা যেমন দুষ্পাচ্য, তেমনি কটু!

অবনী ভাবিল, দলটুকু গড়িয়াছে ভালো! কিন্তু এমনি সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই কি সার্থকতা সুনিশ্চিত! বাঙালী পাঠক-পাঠিকা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা একেবারে বিনির্গত করিয়া দিয়াছে? এখন কি সাহিত্য যাচাই করিবে এই সব সমালোচক? তার মনে ধিক্কার জাগিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল, দুস্তর মরু-প্রান্তরে ধূ-ধূ বালুকারাশি! ও-পথের বিস্তার যেমন অসীম, তেমনি কোথাও একটু ছায়ার চিহ্ন নাই—শ্রান্ত পথিক যে-ছায়ার অন্তরালে নিমেষের জন্য শ্রান্তি ঘুচাইবার আশ্রয় পাইবে!...

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উল্টা স্রোত

সন্ধ্যায় গিরীনের গৃহে আলো-হাসি-গল্প-গানে এক নূতন জগৎ অপরূপ মাধুর্য্যে ভরিয়া অবনীর চোখে উদয় হইল। এ জগতে মিথ্যা খ্যাতির পিছনে অন্ধ মোহে ছুটাছুটি নাই, উন্মাদের মত আন্দোলন নাই, সাহিত্যে শস্তা খ্যাতি কুড়াইবার অধীর আগ্রহ নাই! গৃহের ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যে আছে অবাধ আনন্দ! এখানে ওজন করিয়া কেহ কথা কয় না, লোক বুঝিয়া প্রীতি-হাসি বিলায় না! এখানে মন খুলিয়া অন্তরঙ্গতা—কোথাও কোনো গোপনতা নাই। কাহারো পরিচয় লইতে গবেষণা বা সংশয়ের সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতে হয় না!...হাসি, গল্প, গান যেন মুক্ত ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে! কাহারো প্রতি যেমন পক্ষপাতিতা নাই, তেমনি কোথাও তারা কুণ্ঠা বা কৃপণতা করে না!

এ-মাধুর্য্যে কোথায় উবিয়া গেল অবনীর মনের সে চপল চিন্তা! সে ভাবিল, গৃহ-সংসারে এমন সুখ, এমন শান্তি!

ইহার কাছে ঐ রণ-ক্ষেত্রের শেয়াল-শকুনের লোলুপতা কত তুচ্ছ, কত বিশ্রী!

গিরীনের গৃহে দুজন বন্ধু আসিয়াছিল, তাদের কাছে গিরীন অবনীর পরিচয় দিল—উদীয়মান নভেলিষ্ট শ্রীযুক্ত অবনীলাল সেন। এ-কথায় বন্ধুরা যে-দৃষ্টিতে অবনীর পানে চাহিল, সে-দৃষ্টির স্পর্শে অবনী মুষড়াইয়া গেল।

শ্রীধর কহিল,—ঐ অনিন্দ্য-পরাগদের দলের লোক আপনি?

অবনী কহিল,—আজ্ঞে না।

অজিত কহিল,—দেখবেন মশায়, লেখাপড়া শিখে পথের ময়লা ঘরে জোটাবার ফন্দী করবেন না!

দ্বিবিধ বাক্যে লজ্জায় অবনী মাথা নত করিল।

গিরীন কহিল,—তা নয়। তবে ওকে বহু প্রাজ্ঞ সম্পাদক উপদেশ দিয়েচেন, ঐ পরাগ বোস্ কোম্পানির অনুসরণ করতে।

দুই বন্ধু সমস্বরে বলিয়া উঠিল—ছি-ছি...

শ্রীধর কহিল,—সেক্স্পীয়র চিরদিন হিমালয়ের মত মাথা তুলে জেগে থাকবেন, বাঙলায় আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথও তাই! অত উর্দ্ধে চাইবার শক্তি ওদের নেই, তাই নালার পোকার মত নালা বয়ে চলে! ঐ নালাকেই ওদের কামনার কল্পলোক ঠাউরে নেছে। নালার স্বপ্নেই সর্ব্বক্ষণ বিভোর!

অবনী কহিল,—ও সব কথা থাক্! আমি তাদের লেখা খুব অল্পই পড়েচি। আমার গা ঘিন্-ঘিন্ করে ও-সব লেখা পড়তে। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া অজিত কহিল,—নারী আর

পুরুষের মধ্যে ঐ ইতর সম্পর্ক ছাড়া এরা আর কোনো সম্পর্কের ধারণা বা কল্পনা করতে পারে না! আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়, ইউনিভার্সিটির উপাধির গর্ব্ব বুকে ধরেও ভদ্র-সমাজে এই বীভৎস, নোংরা বেশে বিচরণের নির্লজ্জতা এদের ঘটলো কি করে! ভদ্র শিক্ষিত সমাজ এদের ban করে না? নারী-জাতের প্রতি এদের এই হীন অশ্রদ্ধা—নীচ অপমান?

নির্ম্মলা আসিল, তার পিছনে বেয়ারা। বেয়ারার হাতে ট্রে; ট্রের উপর চায়ের কেটলি, কাপ প্রভৃতি।

শ্রীধর কহিল—এগজামিন কবে? ক'দিন আছে?

নির্ম্মলা কহিল—আর পাঁচ দিন।

অজিত কহিল—কেমন তৈরী হলো?

নির্ম্মলা কহিল—অমনি একরকম...

শ্রীধর কহিল—ভালোই হবে। তার মানে, তুমি কোনো দিন টেক্স্‌ট্‌-বুক্‌গুলোকে বাঘের মত ভয় করো না। আমরা যেভাবে খপরের কাগজ পড়ি—সেগুলোকে তুমি তেমনি করে নেছো...they are as pet and meek as lambs। এটা হলো successএর সব-চেয়ে বড় মন্ত্র।

নির্ম্মলা কহিল,—সাবজেক্টগুলো interesting কি না! ফিলজফিটা আমার ভালো লাগে। সেকস্‌পীয়র, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের কথাই নেই।

অজিত কহিল—টেক্সট-বুক্‌গুলোকে এমনি ভাবে গ্রহণ করতে পারলে কোথাও বাধে না। আজ আমরা উপদেশ দিচ্ছি বটে,

কিন্তু আমরাও এদিকে প্রচুর শৈথিল্য করেচি, তার ফলও তাই ভুগতে হচ্ছে।

নির্ম্মলা কহিল,—এখন ও-আত্মগ্লানি রেখে চা পান করুন।... এই যে অবনীবাবু...সে বই দুটো লেখা সুরু করলেন না কি ?

অবনী দ্বিধায় পড়িল, সত্য কথা বলিবে কি ? কুণ্ঠা হইল—সে সত্য কথায় যেন কতখানি লজ্জা ও অপরাধ! সে তাড়াতাড়ি বলিল,—কি যে করবো, ভেবে পাচ্ছি না! ভারী সমস্যায় পড়েচি। ওরা...

বাধা দিয়া নির্ম্মলা কহিল—এতে ভাববার কিছু নেই, অবনী বাবু। আপনি লেখেন ভালো। আপনার 'গ্রামের মেয়ে' বেশ লেগেচে—বাঙালী ঘরের চমৎকার ছবি! কোনো আড়ম্বর নেই, চমক নেই, উত্তেজনা নেই—সুখ-দুঃখটুকু সুন্দর ফুটিয়ে তুলেচেন।

শ্রীধর কহিল—তাই বুঝি কোন্ অকালপক্ক সম্পাদক উপদেশ দেছে ?...উত্তেজনা না হলে যে ওদের সাহিত্য হয় না। তাহলে একটা গল্প বলি...

নির্ম্মলা কহিল—চা খেয়ে বলুন...

শ্রীধর কহিল—মাপ করো নিমু। যে উৎসাহে গল্পটা গলায় এসে জমেচে, চায়ের স্রোতে যদি তলিয়ে যায়! ভয় নেই, এ প্রকাণ্ড উপন্যাস নয়, বড় গল্পও নয়—এক মিনিটের গল্প...

হাসিয়া নির্ম্মলা কহিল—বলুন তবে। শিবু, তুই পেয়ালায় চা ঢাল্। ওঁরা দুধ-চিনি মিশিয়ে নেবেন।

শ্রীধর কহিল,—সেদিন থিয়েটার গেছলুম—আমারি জানা একটি ছোকরা এক নাটক লিখেচে। সেটা ষ্টেজে প্লে হচ্ছে। নাটকখানার নাম লক্ষ্মণ। সেই নাটকের অভিনয় দেখতে।

অজিত কহিল—হ্যাঁ, দেখেচি বটে,—পথে রঙ-বেরঙের প্লাকার্ড...

শ্রীধর কহিল,—তাতে করেচে কি, রামকে দশরথ বনবাসের কথা বলতে লক্ষ্মণ একেবারে তিড়বিড়িয়ে উঠলো। দশরথকে তো ন ভূত ন ভবিষ্যতি বক্তৃতা দিলে...ছোট লোকের মত দু-চারটে ইতর ইঙ্গিতও ছিল দশরথের প্রথম যৌবনের রূপ-মোহের উপর! শেষে তাতেও শানালো না। একেবারে লাল ন্যাকড়া-জড়ানো তিন হাত এক ধনুকে রাঙতা-মোড়া এক পাঁকাঠির তীর লাগিয়ে বলে উঠলো,—বধিব তোমার প্রাণ, রে বাতুল মূঢ় বৃদ্ধ!...তা দেখে দশরথের হার্টফেল হয়ে গেল। হবার কথাই। আমরা দশরথ না হলেও আমাদের হার্ট টিম্‌-টিম্‌ করছিল। দশরথ তো ঘাড় হেলিয়ে কৌশল্যার কোলে লুটিয়ে পড়লেন...

নির্ম্মলা স্মিত হাস্যে কহিল—বলেন কি! আপনি বাড়িয়ে বলচেন...

শ্রীধর কহিল—সত্যি নয়! এর একটি বর্ণ বাড়িয়ে বলিনি। গালাগালটুকু মুখস্থ হয়ে গেছে একেবারে। আমায় শিউরে দেছে।

গিরীন কহিল—আর এই নাটক দেখেত দর্শক ছুটচে?

শ্রীধর কহিল—শুধু ছোটা নয়। ঐ গালাগালের বাণী শুনে কি হাততালিই পড়লো! আমার মনে হলো, টেরিটী বাজারের যত পাখীওলা এক সঙ্গে অমন বিশ হাজার পায়রা উড়িয়ে দিলে! এইখানেই এর শেষ নয়। ক'খানা ঘুড়ির কাগজ একেবারে ধন্য-ধন্য রব তুলেচে—ছোকরাকে বাঙলার ইবশেন্ গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি না বানিয়ে ছাড়বে না।

—ঘুড়ির কাগজ! নির্ম্মলা কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিল—ঘুড়ির কাগজ কি?

শ্রীধর কহিল—ঐ যে ঘুড়ির কাগজে ছেপে হপ্তায় হপ্তায় বেরোয়—সাপ্তাহিক কাগজ। দু-চারটে খবরের সঙ্গে এরা ঐ থিয়েটারের অভিনয় সমালোচনা করে বেড়ায়। এরা হলো আমাদের দেশের জার্ভাইনাস্, ডাউডেন্...

অজিত কহিল—এত খপরও তুমি রাখো!

শ্রীধর কহিল—সাধে রাখি! পেয়াদায় রাখায়। ঐ নাট্যকার ছোকরা—মানে, বাবা তাকে মাসে মাসে কিছু দিতেন...গরীব—সে-পয়সায় সে লেখাপড়া করতো—বি-এ পাশ করতে পারলে না। চাকরি কিছু নেই! শেষ ঐ থিয়েটার থেকে অমনি কি একখানা কাগজ বেরুতে তার সম্পাদকী জুট্‌লো; আর সম্প্রতি এই নাটক লেখা সুরু করেচে।...তা থিয়েটারে লোক মন্দ হয় নি...Pit full বলে এক সাইনবোর্ড অবধি ঝুলোনো দেখেচি!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অজিত কহিল—থিয়েটারের বিলোপ-পর্ব্ব তাহলে আসন্ন, বলো!

শ্রীধর কহিল—তা কেন? থিয়েটারে লোক ধরে না। এখন উপন্যাস-নাটকের আর্টই হলো অঘটন ঘটানো, উন্মত্ততার আস্ফালন জাগানো!

অজিত কহিল—এর কারণ আছে। দারিদ্র্য-দুঃখে বাঙালীর প্রাণ মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয়ে পড়েচে...তাকে টেনে তুলতে হলে চাই উত্তেজনা...তীব্র বিষের ইঞ্জেক্‌সন্! এ দৈন্য-অভাবে রস-বোধ থাকবে কিসের জোরে? চিন্তাহীন না হলে মন সরস থাকে না। সরসতার অভাবেই মন মূর্চ্ছাতুর হয়, মরে যায়। বাঙালী এখন কঙ্কাল-সার দেহ মাত্র নিয়ে বাস করচে, তার মন ছেঁচে পিষে মরে গেছে। তাই সাহিত্যে এই উন্মত্ত প্রলাপ চলেছে। কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস—যার পাতা খোলো, এমনি অসম্ভব আজগুবি, নয়, নারী জাতটাকে মিষ্টান্ন বানিয়ে পাবার জন্য কুকুরের মত নির্লজ্জ লোলুপতা! কৃত্রিমতা, নয় ন্যাকামি, নয় মানুষের মনের ঐ আদিম পশুবৃত্তি—দীর্ঘকালের কাল্‌চারে যা মরে যাবার মত হয়েচে,—সেই বৃত্তিকে বিষের ইঞ্জেকৃশনে জাগিয়ে তোল্‌বার মত্ত নেশা—এই বস্তুই হয়েচে এদেশে মডার্ণ আর্ট! এর বিরুদ্ধে কথা কইতে গেলে ইতর গালাগালের বন্যা বইয়ে দিতে এরা সর্ব্বক্ষণ সপ্রতিভ!...অন্নাভাব, অর্থাভাব—এ তো আছেই, তার উপর বিবেক-বুদ্ধির অভাব ঘটাবার জন্য একটা রীতিমত অভিযান চলেছে!...ভাববার কথা। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সামনে থাকতেও বাঙালী যদি সাহিত্যে এতখানি উদাসীন হয়, তাহলে বাঙলা সাহিত্য অচিরে মারা যাবে!

শ্রীধর কহিল—ও আবহাওয়া সত্যই যদি রুচিকর হয়, তাহলে এ সব নকল-নবীশের দোরে যাবো কেন? বিলিতি যেগুলোর এঁরা নকল করচেন, সেই আসলকেই অবলম্বন করবো!

অজিত কহিল—Moral tone ধরতে গেলে বিলিতি slum-life আর এদেশী slum-lifeএ বহু প্রভেদ। সেখানকার slum-life হুবহু নকল করলে এখানকার slum-lifeএর সঙ্গে তার কোথাও মিলবে না!

নির্ম্মলা কহিল—আপনারা ক্ষমা করুন, আমাদের আসরকে এ ভাবে সাহিত্য-সম্মিলন করে তুলবেন না! আপনার আলোচনা রেখে ঐ বাজনার সামনে বসুন তো। আপনার গান অনেক দিন শুনিনি...এগ্‌জামিনের দুর্ভাবনায় আমার মন অসুস্থ হয়ে পড়েচে, তাকে সুস্থ করতে চাই। এবং সে সুস্থতা পাবো আপনার গানে!

—বটে! বলিয়া শ্রীধর নির্ম্মলার পানে চাহিল। গিরীন কহিল,—তাই হোক! গাও হে। নিমু কদিন বলছিল, গান শোনবার বড্ড সাধ হয়। আমি বললুম, কেন ঐ রেডিও আছে তো...তা নিমু বললে, কাণ ঝালাপালা করে তোলে।

শ্রীধর কহিল,—তা মিথ্যা বলেনি। লিস্‌নার্সদের রুচির দিকে তাকানো নেই—নিজেদের রুচিকেই ব্রহ্মাস্ত্রের মত প্রয়োগ করচে!

নির্ম্মলা কহিল—আপনি বসুন বাজনার ধারে। বাজে কথায় সময় নষ্ট করবেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অঘটন

গভীর রাত্রে গৃহে ফিবিয়া অবনী দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিল। স্তব্ধ রাত্রি। গিরীনেব গৃহের প্রীতি-মিলনীর স্মৃতিটুকু বুকে এক নূতন জগতের আভাস জাগাইয়া তুলিয়াছিল। হাসি-গল্পে কি সহজ প্রফুল্ল ভাব! কল্পলোকে অবনী ভাব খুঁজিয়া ফেরে—অথচ তাবি গৃহের অনতিদূরে এমন একটি প্রীতির রাজ্য পড়িয়া আছে! কি আনন্দের সংসার!...

নভেলে এমন ছবি সে দেখিয়াছে। অনূঢ়া তরুণী...আনন্দের পশরা বহিয়া ফিরিতেছে—গৃহে তরুণ অতিথিদলের আনাগোনা। উহার অন্তরালে প্রীতির বাঁধনে দুখানি চিত্ত বাঁধা পড়িযা গেল! ঐ নির্ম্মলা! কৈ, তার চোখের দৃষ্টিতে, মুখের বচনে *কোথাও এতটুকু জড়তা নাই—প্রাণ-খোলা আলাপে চিত্তেব গোপন বৃত্তির কোনো ইঙ্গিত নাই! বাস্তব জীবনের এমন স্বচ্ছ লঘু আনন্দ—কেন যে উপন্যাসের পাতায় বেদনা বা কামনাব কাদায় ঘোলা হইয়া দেখা দেয়!...না, না—এ সরল জীবন-

ধারা এমনি বহিয়া চলুক—এ জীবন-ধারায় তার কল্পনার তরী বাহিবার কোনো প্রয়াস সে কোনো দিন পাইবে না!

এমনি চিন্তা কখন তাকে বলিয়া বসিল,—এই স্বচ্ছ নির্লিপ্ত জীবন-ধারায় কলমের কালি ছিটাইয়া কি কাজ! সাহিত্য-চর্চ্চা না করিলে তারও কোনো লোকসান নাই, সাহিত্যেরও নাই। মিছা কতকগুলা চরিত্রের উপর কলমের কালি ছিটাইয়া কৃত্রিমতার সৃষ্টি করা বৈ আর কি লাভ।...উহারা কেহই উপন্যাস লেখেন না, অথচ জীবনের আনন্দ-রস পুরাপুরি ভোগ করিয়া চলিয়াছেন। সে ভাবিতে বসিল, ঐ নির্ম্মলা...তার জীবন-পথে নির্ম্মলাকে যদি সে সঙ্গিনী পায়!...

বিবেক তখনি কশাঘাত করিল। মূঢ়, এ যে ঐ পরাগদের গল্পের হুবহু নকল করিতে বসিয়াছিস্! বন্ধুর গৃহে বন্ধুর ভগ্নীর সহিত মিশিবার সুযোগ যেমন পাইয়াছিস্, অমনি তার প্রতি লোলুপতা!—এ লোলুপতায় বন্ধুত্ব বলো, সখ্য বলো—সমস্তই দারুণ সঙ্কটে আচ্ছন্ন হইবে, বিপন্ন হইবে! মন খুলিয়া কেহ কাহারো সঙ্গে মিশিতে পারিবে না—সকলের মনে সর্ব্বক্ষণ সংশয় জাগিয়া থাকিবে, বিশ্বাস দুর্লভ হইয়া উঠিবে! ছি! মনকে ঠিক করিয়া সে কহিল—খবর্দ্দার!

ঘড়িতে দুটা বাজিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অবনী উঠিল, উঠিয়া বিছানায় গিয়া শুইল।...

রাত্রে শত নিষেধ ঠেলিয়া মনের সামনে স্বপ্ন আসিয়া নির্ম্মলাকে দাঁড় করাইয়া দিল। তার সেই আনন্দ-দ্যুতি-ভরা

সুন্দর মুখ, সহজ হাসি, স্বচ্ছ আলাপ-ভঙ্গী! অবনী যেন লিখিতে বসিয়াছে, আর নির্ম্মলা ঠিক তার পাশে বসিয়া তার প্রাণে বাণীর সঞ্চার করিতেছে!...নির্ম্মলার মুখে-চোখে কি কৌতূহল... দুটি ছত্র লেখা হয়, নির্ম্মলা অধীর আগ্রহে সে ছত্রগুলা পড়িয়া লয়! লেখায় তার উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে সাতগুণ।...তারপর অবনী যেন লিখিতে বসিল, নির্ম্মলার সহিত তার প্রথম পরিচয়ের সেই সুমধুর কাহিনী...মনের মধ্যে সেই যে দোলা জাগিয়াছিল! নির্ম্মলা তাহা পড়িয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কহিল, না, না—ও কথা লিখতে পাবে না...লিখো না। পড়তে আমার ভারী লজ্জা করচে...অবনী ছাড়িবে না, ও-কথা লিখিবেই—তখন নির্ম্মলা খাতা কাড়িয়া কোথায় ছুট্ দিল। অবনী তার পিছনে ছুটিল। ঘর ছাড়িয়া পথে, পথ ছাড়িয়া একটা গৃহে। সে গৃহ? মঞ্জরী অফিস! অবনী যেমন সে অফিসে ঢুকিবে, অমনি চৌকাঠে হুঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। তার ঘুমও সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া অবনী দেখে, মশারির কোণ ছিঁড়িয়া মুখে পড়িয়াছে! উঠিয়া সুইচ্ টিপিয়া সে আলো জ্বালিল— এবং সে আলোয় মশারির কোণ ঠিক করিয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নির্জ্জন নিস্তব্ধ পথ!...একটা ছ্যাকড়া গাড়ীর তীব্র শব্দ—ছ্যাকড়া গাড়ীটা তীরের বেগে আসিতেছে এই পথে।...

হঠাৎ এক ঘটনা ঘটিল। অবনীর বাড়ীর অদূরে মোড়। মোড়ে খানিকটা জায়গা খুঁড়িয়া ড্রেনের কি কাজ চলিয়াছিল—

গাড়ীখানা তীরের বেগে আসিয়া সেখানে ধাক্কা খাইয়া উল্‌টাইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ ! নারীর কণ্ঠ !

সে আর্ত্তনাদে অবনীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। অবনী দ্রুত চটি জোড়ায় পা ঢুকাইয়া পথে ছুটিল।

পথে আসিয়া দেখে, গাড়ী উল্টাইয়া পড়িয়াছে—আর তার মধ্য হইতে শুভ্র বস্ত্রাবৃতা এক কিশোরী দুই হাত তুলিয়া চীৎকার করিতেছে। দুটা কুলি পথে কাজ করিতেছিল। তারা হতভম্ব। গাড়ীর গাড়োয়ান দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। অবনী আসিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া কিশোরীকে দুই হাতে তুলিয়া বাহির করিল। সে মূর্চ্ছিতার মত পথের উপর লুটাইয়া পড়িল। ভয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তারপর কুলি দুটার সাহায্যে ঘোড়ার রাশ খুলিয়া অবনী অতি কষ্টে ঘোড়া দুটাকে মুক্ত করিল। পাড়ার আরো দু'চার জন ততক্ষণে নিদ্রালস্য ভাঙ্গিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়োয়ানটা উঠিয়া আসিলে অবনী তাকে ভর্ৎসনা করিল,—এমন বদমায়েস—এমন জোরে গাড়ী হাঁকাস্‌! মানুষ মারবি, সে খেয়াল নেই ! তোকে পুলিশে দেবো।

গাড়োয়ান পায়ে পড়িল—দুই হাত জোড় করিয়া মিনতি জানাইল। কহিল, তার শাস্তি খুব হইয়াছে—গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়াছে, ঘোড়ার রাশ ছিঁড়িয়াছে—বহুৎ লোকসান !

তার সঙ্গে তর্ক করিবার সময় তখন নয়। অবনী আসিয়া কিশোরীর পানে তাকাইল। তার বয়স বেশী নয়—ভদ্র ঘরের মেয়ে। অবনী কহিল—আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন ? এত রাত্রে ?

মেয়েটি কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল—এখনি বলতে পারচি না। আমায় আগে আশ্রয় দিন। সব কথা বলবো আপনাকে। আমায় বাঁচান।

অবনী অবাক! রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এ কি প্রেহেলিকা জাগিল! অবনী ভাবিল, ঐ সব উপন্যাস-গল্প তার মাথায় জাগিতেছে? না, এ সত্যই...?

এ যে সত্য, তা বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না। মেয়েটি কহিল—আমায় রক্ষা করুন। তার স্বরে করুণ মিনতি!

অবনী কহিল—আসুন আমার সঙ্গে। উঠতে পারবেন?

মেয়েটি কহিল—আমার হাত ধরতে হবে।

অবনী হাত ধরিয়া তাকে তুলিল। মেয়েটি কহিল—গাড়ীর মধ্যে আমার একটা পুঁটলি আছে।

অবনী গাড়ীর মধ্য হইতে পুঁটলি লইল—লইয়া মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া নিজের গৃহে ফিরিল।

পথের কৌতূহলী পথিক-দল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল—এবং অবনী চলিয়া গেলে কোন্ রোমান্স, না, রহস্যের সন্ধান পাইয়া হাসিল।

মেয়েটিকে নিজের ঘরে বসাইয়া অবনী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মাকে ডাকিয়া তুলিবে? উচিত। নহিলে এ কে, কোথায় চলিয়াছিল—সে সব কথা অবনীর তোলা হয়তো খুব উচিত হইবে না! তাছাড়া আশ্রয় দিবার যোগ্য লোক মা।...

অবনী মাকে ডাকিতে চলিল। মেয়েটি কহিল—কোথায় যাচ্ছেন?

অবনী কহিল,—মাকে ডাকি।

মেয়েটি কহিল,—মাকে ডাকবেন!...আপনার স্ত্রী?

অবনী কহিল,—নেই।

আর কোন কথা না বলিয়া অবনী গিয়া মার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল, ডাকিল,—মা...

মার ঘুম সজাগ। মা কহিলেন—অবু! কেন রে?

মা ধড়মড়িয়া উঠিয়া দ্বার খুলিলেন, উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন—কেন রে! অসুখ করে নি তো?

—না।

—তবে?

অবনী কহিল—এক বিপদ ঘটেচে।

—বিপদ?

অবনী আশ্বাস দিয়া কহিল—ভয় নেই, মা—আমাদের নয়! পথে—অবনী ব্যাপারটুকু খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মা বলিলেন—বলিস কি রে! এ যে অঘটন ব্যাপার! চ, চ, দেখি...

মা আসিলেন অবনীর ঘরে। মেয়েটি মেঝের উপর কাঠ হইয়া বসিয়া ছিল। মা তার পাশে বসিলেন, তার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন, কহিলেন—এ যে লক্ষ্মীর মত মূর্ত্তি! ব্যাপার কি মা?...এই রাত্রে একা গাড়ী করে কোথায় যাচ্ছিলে? এই বয়স তোমার...সুন্দরী...!

মেয়েটি কাঁদিয়া ফেলিল। মা কহিলেন—বলো মা...কি

হয়েচে। ভয় নেই। আহা! বাড়ীর লোক-জন কত ভাবচে! আমি এখনি খপর দেবো।

—না, না...মেয়েটি কাঁদিয়া মার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ভগ্ন স্খলিত কণ্ঠে কহিল—আশ্রয় দিন, আমায় আশ্রয় দিন, দয়া করে। বাড়ীতে পাঠাবেন না ...আমায় তারা মেরে ফেলবে!

মার বিস্ময়ের সীমা নাই! অবনীও স্তম্ভিত!

মেয়েটির গায়ে হাত বুলাইয়া মা তাকে আশ্বস্ত করিলেন; মেয়েটির ভয় কতক কমিলে মা সস্নেহে কহিলেন,—বেশ মা, পাঠাবো না। কিন্তু ব্যাপার কি, বলো, কোনো ভয় করো না। যে-কারণেই বাড়ী ছেড়ে আসো, যখন এখানে ঠাঁই পেয়েচো, তখন তোমায় আশ্রয়-হারা করবো না—বিপদের মুখেও পাঠাবো না। এখন শুনি, কি হয়েচে।...তোমায় এ অবস্থায় দেখে আমার ভয়-ভাবনার সীমা-পরিসীমা নেই যে! ভদ্রঘরের মেয়ে...

মেয়েটি সজল চোখে মার পানে, পরে অবনীর পানে চাহিল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমার মা-বাপ নেই, মা। মামার বাড়ী মানুষ হচ্ছিলুম। বাবার কিছু টাকা-কড়ি, মার কিছু গহনা ছিল। মামা আর মামী সে সব নিয়েচে। তার পর...

মেয়েটি চুপ করিল। মা কহিলেন—বলো, লজ্জা করো না।

মেয়েটি আবার একটি নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—বিয়ের পাত্র মিলছিল না—সকলে টাকা চায়। শেষে এক গাঁজা-খোর, না, মাতাল বুড়োকে ধরে আনে আজ রাত্রে। তার কাছ

থেকে টাকাও অনেক নিয়েচে না কি! গোলমাল চলছিল, আমি বেঁকে দাঁড়িয়েছিলুম বলে মামী চিম্‌টে পুড়িয়ে হাতে ছ্যাঁকা অবধি দেছে...দিয়ে ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখে। আমি উপায় না দেখে জানলার গরাদ ভেঙ্গে পালিয়ে এসেচি। আসবার সময় বিয়ের যে গহনা আমায় দিয়েচে, আমার গায়েই ছিল, সেগুলো খুলে আর মামীর বাক্স থেকে যা পেয়েচি টাকা-কড়ি, সেই সঙ্গে নিজের দু'চারখানা কাপড়-চোপড় এই পুঁটলিতে বেঁধে পালিয়ে এসেচি।

মেয়েটি চুপ করিল। সে হাঁফাইতেছিল—ভয়ে-উত্তেজনায়। মা তার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইলেন।

আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি আবার কহিল—পথে একখানা খালি গাড়ী যাচ্ছিল—তাতে উঠে পড়ি। কিন্তু, কোথায় যাবো? জানি না। গাড়োয়ানকে বললুম, কালীঘাটে চল্। খানিক পরে ভয় হলো...আবার বললুম,—না, শেয়ালদায় চ। আবার ভাবলুম, শেয়ালদায় কি করবো! যদি ধরা পড়ি! গাড়োয়ানকে ফিরে-বার বললুম, বাগবাজারের ঘাটে চ!...একটা পুলিশ গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাতে বলে—আমি তাকে পাঁচ টাকা বকশিস দেবো বলে জোরে গাড়ী হাঁকাতে বলি। সে জোরে হাঁকায়...এ-গলি ও-গলি এমনি করতে করতে গাড়ী শেষে উল্টে গেল।...

মার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল। এ যেন আরব্য উপন্যাসের গল্প! অবনীও তেমনি স্তম্ভিত! যেন লোমহর্ষক কাহিনী শুনিতেছিল! এমন ঘটনাও ঘটে!...

মা কহিলেন—কিন্তু...এমন ব্যাপার! পুলিশেও তো জানানো দরকার। নাহলে বিপদ ঘটতে পারে। কি বলিস অবু?

মার কথায় অবনীর চেতনা হইল। অবনী কহিল—বটেই তো! নাহলে সর্ব্বক্ষণ ভয়ে-ভয়ে থাকা—তাছাড়া মেয়ে-চুরির চার্জ্জও তারা দিতে পারে!

মা কহিলেন—সত্য বাবুর সঙ্গে কাল সকালেই দেখা করিস্, বাবা...

সত্য বাবু উকিল—পাড়ায় থাকেন। অবনীদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা আছে।

তারপর মা কহিলেন—তোমার নাম কি, মা?

মেয়েটি কহিল,—কুন্দ।

মা কহিলেন—ব্রাহ্মণ?

মেয়েটি কহিল,—না, কায়স্থ। আমার বাবার নাম ৺দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি কলকাতায় এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে কাজ করতেন।

মা কহিলেন—কতদিন মারা গেছেন?

কুন্দ কহিল,—তিন বছর। মা গেছে এগারো মাস।

মা কহিলেন—যদি বিয়েটি দিয়ে যেতেন...আহা!

কুন্দ কহিল—মামাকে মা খুব পীড়াপীড়ি করতো। মামা রাগ করতো; কখনো বলতো, ভালো পাত্র পাচ্ছি না...

মা কহিলেন—মামার নাম?

কুন্দ কহিল,—হরিশ ঘোষ।

—মামা কি করে?

কুন্দ কহিল,—হাইকোর্টের এক উকিলের কাছে কাজ করে।

—থাকে কোথায় ?

কুন্দ কহিল,—মামা থাকে মাণিকতলায়। ৫ নম্বর রাধানাথ দত্তর লেন।

মা অবনীর পানে চাহিলেন, কহিলেন—তোমার তাহলে কাজ হলো অবু, কাল সকালে এর ব্যবস্থা করা। সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে পরামর্শ নাও। কুন্দকে সে মামার কাছে পাঠানো যেতে পারে না কিছুতে। এর বিহিত যদি আইনে কিছু থাকে, সত্য বাবুকে আমার নাম করে বলো, তা করা চাই। আমি যখন একবার ওকে আশ্রয় দিছি, তখন এ আশ্রয়-ছাড়া করতে পারবো না। ভাগ্যে গাড়ী উল্টেছিল, না হলে অদৃষ্টে কি যে ঘটতো !

মা শিহরিয়া উঠিলেন।...

অবনী গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। মা কহিলেন,—উঠে এসো মা আমার সঙ্গে, মুখ-হাত ধোও। ধুয়ে কিছু খাও। এত রাত্রে কি বা খেতে দি ? একটু মোহনভোগ করি,—দু'খানা লুচি সেই সঙ্গে। খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এখন ঘুমোও। তারপর যা করবার, কাল করবো। তোমার ভয় নেই।

কুন্দ কহিল—কিছু খাবো না মা। খাবার প্রবৃত্তি নেই, খিদেও নেই। শুধু এক ঘটি জল আমায় দিন, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

মা কহিলেন—শুধু জল খায় না, মা। আমার কোনো কষ্ট হবে না। তুমিও না হয় সাহায্য করো। কি বলো ?

মা হাসিয়া কুন্দর পানে চাহিলেন। কুন্দর প্রাণ সন্ত বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া আবার যেন বাঁচিয়া উঠিতেছিল।

সদরে কে হাঁকিল—বাবু...

অবনী চহিয়া দেখে, সেই গাড়োয়ানটা। সে কহিল—কি চাস্?

গাড়োয়ান কহিল—আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বাবু...

কুন্দর কথা অবনীর মনে পড়িল। পুলিশ তাকে ডাকিয়াছিল ...কে জানে—তাহা হইতে যদি কোনো...

অবনী কহিল—দাঁড়া।

পরক্ষণে নামিয়া আসিল। গাড়োয়ানের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়া কহিল—যা, চুপ্‌চাপ চলে যা। তোকে পুলিশে ডেকেছিল কোথায়?

গাড়োয়ান কহিল—সার্কুলার রোডে।

—তোর নম্বর চেয়েছিল?

—না বাবু...আমি হাঁকিয়েচি খুব জোরে। ধরতে পারেনি।

অবনী কহিল—অত জোরে গাড়ী হাঁকিয়েছিলি...নম্বর পেলে জরিমানা হতো। সাবধান, এ কথা কাকেও বলিস্ নে যেন...

পঞ্চ মুদ্রায় প্রচুর খুশী গাড়োয়ান কহিল—না বাবু। ভদ্দর ঘরের মেয়েনোক বিপদে পড়েচেন—তা আর আমি বুঝি না! শেষে যদি পুলিশ-হাঙ্গামা বাধে...

অবনী কহিল—তাই। হুঁশিয়ার। প্রকাশ করলে বিপদ...

গাড়োয়ান কহিল—তা আমি বুঝি, বাবু। সে আর বলতে হবে না!...

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কুন্দ

কল্পনার ফেনায় বুদ্বুদ্ রচা ঘুচিয়া গেল। সকালে কুন্দ আসিয়া অবনীর সামনে চায়ের পেয়ালা ধরিয়া দিল। মা'ও আসিলেন। মা কহিলেন—এক পলকে কুন্দ কি মায়া রচে তুললো, বাবা...নিজে চা তৈরী করলে। ভারী শান্ত মেয়েটি!

কুন্দর মুখ সস্মিত হইয়া উঠিল। অবনী চাহিয়া দেখে—কুন্দর শ্রী প্রভাতের আলো পাইয়া কুন্দ ফুলের মতই মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে! উজ্জ্বল শ্যামল বর্ণে করুণ মুখশ্রীটুকু—শ্রাবণের মেঘের মত মনোরম!

মা কহিলেন—চা খেয়েই সত্যবাবুর কাছে যাচ্ছো তো?

অবনী কহিল—নিশ্চয়।

মা কহিলেন—যদি তাঁর অবসর থাকে, একবার এ বাড়ীতে ডেকে আনতে পারলেই ভালো হয়। যদি কোনো কথা জানবার থাকে, কুন্দ তখনি বলতে পারবে।

অবনী কহিল—কিন্তু এ সময়ে তাঁর পাঁচজন মক্কেল আসে—সুবিধা হবে কি ?...আচ্ছা, দেখি—বলবো সে কথা।

চা পান করিয়া অবনী চলিয়া গেল।...এবং আধঘণ্টা পরে সত্যবাবু তার সঙ্গে আসিলেন ; আসিয়া কুন্দকে দেখিলেন—প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন—তোমার বয়স ক' বছর হলো মা-লক্ষ্মী ?

কুন্দ কহিল,—গেল আশ্বিনে ষোলয় পড়েচি।

সত্যবাবু বলিলেন—বেশ...

তারপর আলোচনায় স্থির হইল, পুলিশে একটু জানান্ দেওয়া প্রয়োজন। কেন না, ও গহনাগুলা সেই বুড়া বরের। বিবাহ করিতে না পারিয়া মামাকে সে ছাড়িয়া কথা কহিবে না। কাজেই মামাকে...কিন্তু সে পথ বন্ধ করিতে চাই। পুলিশে জানানো হোক্, এক কাপড়ে চলিয়া আসিয়াছে ! তারপর ঐ ঘরে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখা—এ তো মস্ত অপরাধ পেনাল্ কোডের মতে। আচ্ছা...দেখা যাক, খবর লই, উহারা কি করিল ! সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার এলাকা—

সত্যবাবু চলিয়া গেলেন। অবনী সঙ্গে যাইতে চাহিল—সত্যবাবু নিষেধ তুলিলেন—না, আমি নিজে যাবো থানায়। খবরাখবর নি ! তারপর যেমন যা করা দরকার, করবো।

অবনী কহিল—একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দি।

সত্যবাবু কহিলেন,—তা দাও। হয়তো দৌড়োদৌড়ি করতে হবে। কেন না, মামা চুপ করে থাকবে না।

থানা হইতে সত্যবাবু নিজের গৃহে ফিরিলেন এক ঘণ্টা পরে। ফিরিয়া সংবাদ দিলেন, মামা থানায় লিখাইয়াছে, তার ভাগিনেয়ী কুন্দ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, তার পিতার যা কিছু সম্পত্তি ছিল, সে সব লইয়া। অর্থাৎ, থানার কেতাবে মাতাল বরের নামোল্লেখ নাই, পাছে তা লইয়া কোনো মামলা-মকর্দ্দমা বাধে, এবং ফ্যাসাদে পড়ে! সত্যবাবু পরামর্শ দিলেন—কুন্দর মা-বাপের টাকাকড়ি ও গহনার কিছু যদি আদায় হয়, চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি! মামা যখন একবার ঐ কথা বলিয়া নালিশ লিখাইয়াছে, তখন বরের দেওয়া গহনার কথা আর সে তুলিতে পারিবে না—তুলিলে কোনো ফল হইবে না!...

সত্যবাবু মামার নামে এক নোটিশ ছাড়িলেন—নোটিশের মধ্যে ঘরে চাবি বন্ধ রাখার উল্লেখও করিলেন, এবং উপসংহারে কুন্দর পিতার পরিত্যক্ত টাকাকড়ি এবং মাতৃ-পরিত্যক্ত গহনার ডিমাণ্ড করা হইল; চিঠিতে জানানো হইল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডিমাণ্ড যদি মিটাইয়া না দেয়, তাহা হইলে—ফরিয়াদী ও দাওয়ানী, দ্বিবিধ মামলা তার ও তার স্ত্রীর নামে রুজু করা হইবে।

অবনী কহিল—সত্যি মামলা করবেন?

সত্যবাবু কহিলেন—শিক্ষা দেবার জন্য করা উচিত নয় কি?

অবনী কহিল—কুন্দকে আদালতে দাঁড়াতে হবে তো?

সত্যবাবু কহিলেন,—তা হবে বৈ কি।

অবনী কহিল,—সে ভালো দেখাবে না। বিশেষ তার

বিবাহ হয় নি। এ নিয়ে গোলমাল উঠলে মেয়েটির বিয়েয় হয়তো মুস্কিল বাধবে।

সত্যবাবু কহিলেন—তা বেশ। মামলা না হয় নাই করলুম—কিন্তু ভোগা দিয়ে নেবে সব, তা ঘটতে দেবো না। চোখ রাঙিয়ে যা পারি, আদায়ের চেষ্টা দেখি।

অবনী কহিল,—সে বেশ কথা।

সত্যবাবুর গৃহ হইতে অবনী ফিরিল—বেলা তখন দশটা বাজে। মা দোতলার দালানে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, কুন্দ তার কাছে বসিয়া তরকারী কুটিতেছে। সগুস্নাতা কিশোরী ...রূপের হিল্লোলে সেখানটা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! মা কহিলেন—কি হলো?

অবনী সব কথা খুলিয়া বলিল। মা বলিলেন,—আদালতে নিজে থেকে যাওয়া হতে পারে না। অবশ্য তেমন হলে নিরুপায়ে যেতেই হতো। ছাখো, হুম্‌কি দিয়ে কিছু যদি আদায় হয়!

অবনী নিজের ঘরে চলিয়া গেল। গিয়া দেখে, ঘরটি পরিপাটী শৃঙ্খলায় গুছানো। কোণে অল্প ঝুল জমিয়াছিল, সে ঝুল অদৃশ্য হইয়াছে। টেবিলের উপর তার বই-খাতাগুলা সুশৃঙ্খলে বিন্যস্ত। উপন্যাস ও গল্প লেখার খাতা-প্যাড সাজানো রহিয়াছে। কলমের নিব পরিষ্কার কালি-মোছা। ফাউণ্টেন পেনে কালি পোরা হইয়াছে। প্যাডের উপরে যে কালি-মাখা ব্লটিং ছিল, সেটা অন্তর্হিত; উপরের ব্লটিংখানা দুধের ফেনার মত সাদা ধপ্‌ধপ্‌

করিতেছে। অবনী জামা খুলিয়া আলনায় ঝুলাইয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে গাঙ্গুলিদের বাড়ীর উঠানের বড় নারিকেল গাছের পাতাগুলা বাতাসের দোলা পাইয়া যেন আকাশের গায়ে চামর দুলাইতেছে। দত্তদের বাড়ীর ছাদে একটি মেয়ে ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতেছে...

কুন্দ আসিয়া কহিল,—মা ডাকচেন।

অবনী ফিরিয়া চাহিল। কুন্দ নত মুখে দাঁড়াইয়া; অবনী মৃদু হাসিল, হাসিয়া কহিল,—এ ঘর গুছালে কে? তুমি?

ঘাড় নাড়িয়া কুন্দ জানাইল, সে। বলিল, মা অনুমতি দিয়াছিলেন, তাই।

অবনী কহিল,—আমি তা বুঝেচি।

কুন্দ কহিল,—কোনো ভুল হয়েচে?

অবনী কহিল,—ভুল!...তা নয়। খাশা হয়েচে।...যে ক'দিন আছো, একটু গুছিয়ে রেখো। মা আমায় কত বকে, তা আমি পারি না। ভারী অগোছালো আমি। সে পরিচয় তুমি পেয়েচো নিশ্চয়।

সলজ্জ মৃদু হাস্তে কুন্দ অবনীর মুখের পানে চাহিল। অবনী তার পানেই চাহিয়া ছিল। কুন্দর দৃষ্টি অবনীর দৃষ্টির সহিত মিলিতে কুন্দ সলজ্জে দৃষ্টি নত করিল।...

অবনী ডাকিল—কুন্দ...

কুন্দ চাহিল। অবনী কহিল—তুমি লেখাপড়া করতে পেতে? মামার যে পরিচয় পেলুম, তাই জিজ্ঞাসা করচি...

কুন্দ কহিল—যতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন, পড়ছিলুম!

—স্কুলে পড়তে?

কুন্দ কহিল,—হ্যাঁ। ফোর্থ ক্লাশ অবধি পড়েচি। বাবা মারা গেলে স্কুল বন্ধ হলো। মামার বাড়ী এক মামাতো ভাই আস্‌চে-বছর ম্যাট্রিক দেবে—তার বইটইগুলো মাঝে মাঝে উল্টে দেখতুম।

অবনী কহিল—তোমার পড়ার ইচ্ছা যদি থাকে, আর এখানেই যদি থাকা হয়, তাহলে আমি তোমায় স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবো। তুমি পড়ো—পড়ে পাশ দাও...ম্যাট্রিক, ইণ্টারমিডিয়েট, বি-এ...

তার মনে নির্ম্মলার কথা জাগিতেছিল। তার যদি ছোট একটি বোন্ থাকিত, তাহা হইলে ঐ নির্ম্মলার মতই তাকে পড়াইয়া বি-এ পাশ করাইত। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা পাশ করিবে—এ তার বড় সাধের কল্পনা! দিদির বেলায় তা ঘটে নাই। সে-সম্ভাবনাও ছিল না...

কুন্দ কোনো জবাব দিল না, শুধু কহিল—মা ডাকচেন।

—চলো। বলিয়া অবনী কুন্দর সঙ্গে মার কাছে চলিল।

অবনীকে দেখিয়া মা বলিলেন—একটা কথা আছে, অবু...

অবনী কহিল—কি কথা মা?

মা কহিলেন—কুন্দর কাছে সব কথা শুনছিলুম বসে। ও-গহনাগুলি কুন্দর মার। মামা এগুলি বাঁধা দিয়েছিল ঐ পাত্রের কাছে। বাঁধা দিয়ে সে টাকায় জুয়ো খেলেচে, দোতলায় রান্নাঘর

তৈরী করেচে। বাড়ীর অর্দ্ধেকটা ভাড়া দেওয়া। তাহলে গহনা যেমন করে হোক্ উদ্ধার তো হলো,—কিন্তু ওর বাপের তিন হাজার টাকা...শুনচি, সে টাকায় কোম্পানির কাগজ করে দেছে ওর মামীর নামে...

অবনী কহিল—এ যে বিস্তর লটঘটি দেখচি।

মা কহিলেন—তাই। তুই বাবা সত্যবাবুকে ধর্...কুন্দর যা কিছু আছে, তার যতখানি উদ্ধার হয়...তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বিয়ে-থা করুক। নিজের থাকতে দুঃখী-গরীবের মত মাথা নীচু করেই বা থাকবে কেন? আমি সত্যবাবুর ফী দেবো। এ সব কাজ ব্যাগারে হয় না—হাজার হোক্ তাঁর ঐ পেশা!

অবনী কহিল—বেশ। তাহলে আমায় সত্যবাবুর কাছে যেতে হয়—ওঁর কোর্টেই বরং যাই! সে কথাও ভাবছিলুম—যদি মামা আর ঐ পাত্তরটি আদালতে গিয়ে কোনো নালিশ-মকর্দ্দমা করে!

মা কহিলেন—সে কথা মন্দ নয়। তার উপর আমি বলি, পুলিশ নিয়ে মামার কাছে গেলে কোনো ক্ষতি আছে কি? এত বড় ব্যাপার ঘটলো...সত্যি, ভাবতে আমার গায়ে কাঁটা দেয় এখনো!...এ রকম ঘটনা তো সেই হরিদাসের গুপ্ত-কথায় না, এম্‌নি কোন্ বইয়ে পড়েছিলুম সেকালে। এমন যে ঘটতে পারে, তা কখনো ভাবিনি।

অবনী কহিল—আমি স্নান করে নি। তুমি কিছু খাওয়াও; কোর্টেই যাই।...আমার একটি বন্ধুও আছে, কেশব,—পুলিশ-

কোর্টে ওকালতি করতে ঢুকেচে। তাকেও ধরি। সত্যবাবু হাজার হোক্ সিনিয়র উকিল...পাঁচটা কাজের ঝামেলা আছে তাঁর!

মা কহিলেন—তাই ছ্যাখ্ বাবা। ভগবানও তোর ভালো করবেন।

অবনী চলিয়া গেল। মা প্রণাম সারিয়া কুন্দকে বলিলেন—তুমি মা অবুর জন্য ওর ঘরের সামনে ঐ ভিতরের বারন্দায় ঠাঁই করে দাও। তোমার কাজ এ নয়, তা তুমি যখন ধরেচো! নাহলে এ কাজ ওই গুপী বেয়ারাই করতো।

আহারাদি সারিয়া আদালতে গিয়া অবনী দেখে, উদ্বেগের কোনো কারণ নাই। হরিশ বা হরিশের মনোনীত সেই শিশুপাল পাত্র সে-ধার মাড়ায় নাই।...সে নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিল।...

তারপরও কিন্তু আইন-আদালত লইয়া কোনো কলরব উঠিল না। সত্যবাবু হরিশ ঘোষকে নোটিশ দিয়াছিলেন; হরিশ আসিয়া সত্যবাবুর কাছে কাঁদিয়া পড়িল। এত বড় মকর্দ্দমা বাধিলে সহরে সোরগোল পড়িবে, খবরের কাগজে অবধি হৈ-হৈ উঠিবে—কে জানে, সে খবর পড়িয়া মনিব যদি রাগিয়া ওঠেন! সে ফৌজদারী মামলায় পড়িলে মনিবের কাজ কে করিবে? তাছাড়া মনিব ব্যবসায়ে আইন-জীবী হইলেও সভা-সমিতিতে নারী-জাগরণ সম্বন্ধে আন্দোলন তুলিয়া বেড়ান। মনিব ভালো। তাঁর কাছে বহুকাল সে কাজ করিতেছে। শুধু তাই নয়, নিজের বসত-বাড়ীখানি মনিবের কাছে ঋণের জন্য বন্ধক আছে।

সত্যবাবু কহিলেন—টাকা-কড়ি দিয়ে দাও তাহলে। বেচারীর জীবনের সম্বল ঐটুকু।

হরিশ ঘোষ কহিল—টাকাটা আমি খরচ করে ফেলেচি, বাড়ী করতে।

সত্যবাবু কহিলেন—ওর মার গহনা?

হরিশ কহিল—সেই গহনাই ঐ উমেশের কাছে বাঁধা ছিল—সে দিয়েচে। বিয়ের রাত্রে গহনা মেয়ের গায়ে ছিল। উমেশ বিয়ে করতে আসে...তার কাছে ঐ গহনা বন্ধক ছিল। সে বলে, বিয়ে দেবো বলে ঠকিয়ে তার কাছ থেকে গহনা হাত করেচি, আর বিয়ে দিইনি। নালিশ করবে বলে এখন শাসাচ্ছে।

সত্যবাবু কহিলেন—নালিশ করে, তুমি জেলে যাবে। তাবলে ও-গহনা সে ফেরত পাবে না। কারণ গহনা মেয়ের—সে গহনা বাঁধা দেবার তোমার কোনো অধিকার থাকতেই পারে না।... বাঁধা দেওয়ার জন্য তোমার নামে কুন্দমালা নালিশ করলেও ঐ জেল!

দু'চার কথার পর সত্যবাবু সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, উমেশ-বর আদালতে যাক, যা ইচ্ছা করুক, তিনি তাহাতে তিলমাত্র বিচলিত হইবেন না। মেয়ে সাবালিকা—জোর করিয়া তার বিবাহ দিতেছিলে এক অপাত্রে...সে তাহাতে রাজী নয় বলিয়া নিজের ইচ্ছায় চলিয়া আসিয়াছে...তারো যেমন কোনো দায় ইহাতে নাই, তেমনি যাহার গৃহেই সে আশ্রয় নিক, সে-আশ্রয়-দাতাও সম্পূর্ণ নিরাপদ!

নিরুপায় চিত্তে হরিশ কহিল—আমার ভাগনী, তবু! বিয়েও দিচ্ছিলুম! উমেশ কি যে করবে শেষে...

সত্যবাবু কহিলেন—সেজন্য চিন্তা করি না বাপু! তোমার মত মামার হাত ফশ্‌কে যখন এসেচে, তখন ভালো পাত্রেই তার বিবাহ হবে। সে ভদ্র ঘরে আশ্রয় পেয়েচে, বুঝলে!...

দু'চার দিন এমনি যাতায়াতের পর হরিশ একদিন বলিল,—উমেশ এখনো শাসাচ্ছে...সে যদি নালিশ করে, আপনি আমায় সে দায়ে রক্ষা করবেন।

সত্যবাবু কহিলেন—শঠে শাঠ্য নীতি! কোনো কাগজপত্র লিখে গহনা নিয়েচো কি ?

—আজ্ঞে না।

—তবে যাও—নিশ্চিন্তে বসে থাকোগে। সে নালিশ করে, তখন আমার কাছে এসো। যা হোক উপায় তখন করা যাবে।

কোনো মতেই সত্যবাবুকে করুণার্দ্র করিয়া তুলিতে না পারিয়া হরিশ অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। উমেশকে সে তখন রাজী করাইল, হরিশের এগারো বছরের মেয়ে আছে—তার সঙ্গেই উমেশের বিবাহ হোক্!...উমেশও এক রকম রাজী হইয়াছে। কিন্তু এ কথা সে সত্যবাবুর কাছে ভাঙ্গিল না, গোপন রাখিল। তবে মনে মনে সঙ্কল্প রহিল,—চুপি চুপি সন্ধান লইবে—কুন্দ হতচ্ছাড়ীকে যদি কোনো দিন হাতে পায়, তো এ অপমান, আর তার এ স্পর্দ্ধার রীতিমত শোধ লইতে ছাড়িবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সাহসিকা

জীবনে এক নূতন অধ্যায় সুরু হইল। মা সারদা দেবী কুন্দকে মেয়েব আদবে বুকে রাখিলেন। তাঁর নিজের মেয়ে আছে। বিবাহ দিয়া মেয়েটিকে সেই যে শ্বশুব-বাড়ী পাঠাইয়াছেন, কালে-ভদ্রে সে মার কাছে আসে। ছেলে অবনী—নিজেকে লইয়া আছে। তার বিবাহ দিয়া বৌ আনিবেন, তাহাতে ছেলে বাদ সাধিয়া চলিয়াছে। তাঁর নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলা কি করিয়া কাটে, তা তিনিই জানেন। সংসার তো ঐ এক ছেলেকে লইয়া—কি বা কাজ। সংসারের উপর অবনীর কোনো ঝোঁক নাই। মার মন তাই শূন্যতার মাঝে শুধু অবলম্বন খুঁজিয়া ফিরিতেছিল—কাজেই কুন্দ আসিয়া সে শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া তুলিল।

তাকে সাজাইয়া গুছাইয়া, তাকে ফাই-ফরমাশ করিয়া তিনি আজ যেন মস্ত কাজ হাতে পাইয়াছেন। সংসারের কাজে কুন্দ সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছে। অবনীর খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করে, অবনীর লেখার টেবিল, পড়ার বই গুছাইয়া রাখে। সারদা

ভাবেন, মেয়েটিকে যদি আহা...তা কি হইবে? ছেলের যা সংসার-বিরাগী মন...!

কুন্দ ক্রমে অবনীর সাহিত্য-চর্চ্চায় যোগ দিল। খাতা-পত্র গুছাইতে গিয়া সে তার পাতা খুলিয়া পড়িত। একদিন সে বসিয়া "দূর করো বিবাহের বন্ধন" উপন্যাসের যেটুকু লেখা হইয়াছিল, পড়িতেছিল, এমন সময় অবনী আসিয়া কহিল—ও কি হচ্ছে? চৌর্য্য?

কুন্দ কহিল—চৌর্য্য কিসের?

—নয়? ও তো ছাপা বই নয়...কাজেই লেখক ছাড়া ও বই দেখবার অধিকার কারো নেই এখন।

হাসিয়া কুন্দ কহিল—আমি সে কারোর দলে নই। আমার জোর আছে।

—জোর! অবনী কৃত্রিম-গাম্ভীর্য্য-ভরা স্বরে প্রশ্ন করিল,—কিসের জোর?

কুন্দ কহিল—আমি বোন হই।

বোন! ঠিক! কথাটা মিষ্ট লাগিল। অবনী কহিল—হুঁ!...

অবনী জামা খুলিয়া আলনায় রাখিল, রাখিয়া ইজিচেযারে বসিল।

কুন্দ কহিল—শরবৎ আনি?

অবনী কহিল,—না। তুমি আর আমায় বাবু করে তুলো না, কুন্দ...

কুন্দ কহিল—এতে বাবু করা হয় বুঝি! এতখানি পথ হেঁটে এলেন...

অবনী কহিল—চিরদিন তাই এসেচি।...কি পড়ছিলে?

কুন্দ কহিল—আপনার লেখা—দূর করো বিবাহের বন্ধন।

অবনী একটু লজ্জা-কুণ্ঠিত হইল। যে-উদ্দেশ্যে ও বই লেখা হইতেছে, কুন্দ তা জানে না। জানে না বলিয়া তার সম্বন্ধে যদি কোনো রকম বদ ধারণা করিয়া বসে!...সে কহিল—ওটা লিখতে সুরু করেছিলুম...শেষ হবে কিনা, জানি না। সে আগ্রহ আর নেই।

কুন্দ কহিল—সত্যি?

অবনী কহিল—হলফ্ করে বলতে পারচি না—তবে, বহু দিন আর ওটা লিখিনি। সেই যেদিন তুমি এলে—সেই দিন থেকে।...

কুন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝি, কি ভাবিতেছিল।

অবনী তাহা লক্ষ্য করিল; লক্ষ্য করিয়া কহিল,—কি ভাবচো?

কুন্দ কহিল—এটা আর লিখবেন না।

অবনী কহিল—কেন? লেখা ভালো হচ্ছে না?

কুন্দ কহিল—তা ঠিক নয়। তবে গল্পটা যেন কেমন-কেমন...ঐ যে সব আজ-কাল লেখে—

অবনী কহিল—তুমি সে সব লেখা পড়ো

কুন্দ কহিল—পড়তুম। আমাদের পাশের বাড়ীতে এক-জনরা ভাড়া এসেছিল—তাদের বৌ...সেই বৌয়ের ভাই একখানা কাগজে গল্প লেখে। তাই তাদের বাড়ী কাগজ আসে—"ছুনিয়ার আলো" মাসিক-পত্র। তাদের বাড়ী থেকে আরো বই এনে পড়তুম—ছুনিয়ার আলোও পড়তুম সেই সঙ্গে।

অবনী কহিল—বটে!...তা, ভালো লাগতো না পড়তে?

কুন্দ কহিল—পড়তে হতো। সেই বৌয়ের ভাইয়ের লেখা কি না...সে পড়তে বলতো। তাছাড়া বিজ্ঞাপন অবধি যখন পড়তুম, তখন ও লেখাও বাদ দেওয়া চলতো না।...

অবনী আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। সেও কি ভাবিতে-ছিল! বহুক্ষণ পরে কহিল,—এ লেখাটা ভালো নয়? না? আর লিখবো না।

কুন্দ কুণ্ঠা-ভরে কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর কহিল—সে কথা আমি বলচি না। তবে, এ লেখা সেই তাদের মতন কি না! আপনার 'গ্রামের মেয়ে' আমি পড়েচি। আমার খুব ভালো লেগেচে।

অবনীর একটু আনন্দ বোধ হইল। কুন্দর পানে চাহিয়া অবনী কহিল—তুমি এ লেখার ইতিহাস জানো না, কুন্দ। আমি সাধ করে এ বিবাহ-বন্ধন দূর করার বই লিখচি না—দায়ে পড়েই লিখতে হচ্ছে!

—কেন?' কুন্দর স্বরে একেবারে আগ্রহ মাধুর্য্যে ভরিয়া উছলিয়া উঠিল।

অবনী কুন্দর পানে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—সে কথা শুনবে? এক কাহিনী!

—শুনবো।

অবনী তখন সংক্ষেপে এ-উপন্যাস লেখার ইতিবৃত্ত খুলিয়া বলিল। শুনিয়া কুন্দ কহিল—ওদের কাগজ ছাড়া কি আর কাগজ নেই যাতে আপনার লেখা ছাপতে দেন?

অবনী কহিল—একটু মুস্কিল আছে, কুন্দ। অর্থাৎ ভালো কাগজ—তারা যার-তার নতুন লেখা ছাপতে রাজী নয়। তাদের আমোল পাই না। নিজেদের প্রতিষ্ঠার উপর দম্ভ-মঞ্চ তৈরী করে এমন গম্ভীর মুখে তারা বসে আছে যে তাদের সামনে দাঁড়াতে সাহস পাই না। আর এরা? অত্যন্ত সুলভ... তাছাড়া খ্যাতি-সম্বন্ধে এরা এমন কলরব তুলে ফেরে যে লোকের মুখে-মুখে আজ-কাল এদেরই নাম তুমি শুনবে। এদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে সাধারণে অর্থাৎ পাব্লিকে ভয় পায়; কিম্বা ভক্তিতে বা ভয়ে তা করে-না, তা জানি না। তবে এদের যে লেখা ছেপে বেরোয়, তাতেই এরা ধন্য-ধন্য রব তোলে! সংখ্যায় এরা বহু—কাগজও এদের অলিতে-গলিতে শাখা-প্রশাখা মেলে বেরুচ্ছে! এরা জনে-জনে সেকন্দর দি গ্রেট্! অদ্ভুত এদের আত্ম-স্তুতির নির্লজ্জ শক্তি! এদের সঙ্গে যোগ দিলে খ্যাতি মিলবে অতি শীঘ্র—সাধারণের কাছ থেকেও বাহবা মিলবে। তাতে একটা উপকার হবে এই যে লেখার প্রথম মুখে খুব-জোর start পাবো।...বুঝলে?

কুন্দ কহিল—আমি ভালো বুঝতে পারলুম না।...বড় কাগজে যাঁরা লেখেন, তাঁদের নামও কে না জানে? তাছাড়া সকলে তাঁদের কত সম্ভ্রম করে। এই ধরুন, বঙ্কিমবাবুর লেখা, রবীন্দ্রনাথের লেখা...। এদের লেখায় তো দেখি, যা ঘটে না, ঘটতে পারে না, ঘটলে বিশ্রী হয়—সেই সব কথা...

অবনী কহিল—শেষের কথাটুকু যা বললে, আমিও আগে তাই ভাবতুম। কিন্তু তোমায় যে-রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে কাছে পেয়েচি, তা থেকে আমার সে ধারণা উল্টে যাচ্ছে...

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কুন্দ অবনীর পানে চাহিয়া রহিল। অবনী কহিল—বুঝচো না?...রাত দুটোয় আমি বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি...ঝড় নেই, জল নেই...রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটেনি, হুন্ বা শক, কিম্বা নাদিরশা'ও নগর আক্রমণ করেনি—হঠাৎ তীরের বেগে পথে এলো একখানা থার্ড-ক্লাশ গাড়ী... এমন আসে, জানি, এবং মানিও। কিন্তু তারপর? অত রাত্রে গাড়ী উল্টে পড়লো, আর আর্ত্ত রব তুলে সে গাড়ী থেকে বেরুলে তুমি—বাঙালী-ঘরের তরুণী মেয়ে, একা! কি সাহসিকার বেশেই তুমি গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছিলে!... এ রকম তাজ্জব ব্যাপার কল্পনা করতেও আমি ভয় পেতুম!... ওরা এমনি গল্প লেখে বলে আমি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করেচি ঢের—অসম্ভব, আজগুবি আখ্যাও দিয়েচি। কিন্তু সে অসম্ভব আজগুবি আমারি চোখের সামনে ঘটলো তো...

কুন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো কথা কহিল না।

অবনী কহিল—মাঝে মাঝে তাই ভাবি...ঐখান থেকে সুরু করে একখানা উপন্যাস যদি ধরি...তোমার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে, তা হলে কেমন হয়?

প্রচণ্ড উৎসাহে কুন্দর মন একেবারে মাতিয়া নাচিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত আগ্রহে সে কহিল—লিখবেন? সত্যি? বেশ হয়...না?

অবনী কহিল—তারপর কিন্তু কি—তুমি একটু ধরিয়ে দিতে পারো? প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়ায় তোমার গাড়ীর চাকা ভেঙ্গে পড়লো, শেষের দিকে তুমি আমাদের বাড়ী এসে উঠলে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাতুল মহাশয়ের কাহিনী—এটা খুব harrowing করে তুলবো। এমন harrowing যে সমাজে হয়তো বিপ্লব বেধে যাবে! কিন্তু তার পর তৃতীয় পরিচ্ছেদে কি ধরি?

কুন্দ ভাবিতে বসিল; হঠাৎ হাসিয়া কহিল,—আপনার টেবিল গুছোনো—চুরি করে আপনার লেখা গল্প-কবিতা পড়া, তারপর ধরা পড়ে...

বলিতে বলিতে কি এক অজানা লজ্জায় তার কণ্ঠ বাধিয়া গেল। অবনী বেশ কৌতুক বোধ করিতেছিল। সে কহিল—আচ্ছা। এটা যেন হলো তৃতীয় পরিচ্ছেদ। তারপর চতুর্থ পরিচ্ছেদ?

পূর্ব্ব-পঠিত গল্প-উপন্যাসের পাতায় পাতায় মনকে ঘুরাইয়া কুন্দ সন্ধান লইতেছিল, সে সব জায়গা হইতে কোনো হদিশ্ পাওয়া যায় কি না...সহসা অবনীর হাস্য-মিশ্রিত স্বরে তার চমক ভাঙ্গিল।

হাসিয়া অবনী কহিল—এর পরই ওরা গোল বাধিয়ে বসে... এই ভাই-বোনের চমৎকার হাসি-গল্পের উপর এমন কালো কালি ঢেলে দেয় যে আমাদের মন সে কালির স্রোতে ভেসে যায়; পাঠকের মনকেও কালি-মাখা করে তোলে। নয়? বলিয়া অবনী হাস্যরবকে উচ্চতর করিয়া তুলিল।

সে হাস্য-রবে কুন্দর ভাবরাজ্যে-ঘোরা তন্ময় চিত্ত কেমন অতর্কিত আঘাত পাইল! তার কণ্ঠ একেবারে নীরব হইল।...

অবনী কহিল—এখনো ভাবচো? আচ্ছা, ভাবো...আমিও ভাবি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়! এই নিয়েই আমি উপন্যাস লিখবো। ও বিবাহ-বন্ধন সত্যই দূর করে দাও। এই উপন্যাসেই আমি জয়-টীকা কপালে আঁটবো। তোমার কাহিনী অবলম্বন করে—তোমার সে নৈশ অভিযান... বীরেন্দ্রাণীর মত সেই বিপদের সঙ্গে লড়া। উপন্যাসের নাম দেবো, সাহসিকা। কি বলো?

কথাগুলা কুন্দর কানের ভিতর দিয়া মনের মধ্যে গড়াইয়া চলিল। সে কোনো কথা কহিল না, নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল।...

আরো দু'দিন পরের কথা। সারদা দেবী স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন, কুন্দ বসিয়া বাজারের হিসাব লইতেছিল, অবনী আসিয়া ডাকিল,—কুন্দ...

কুন্দ ফিরিয়া চাহিল। অবনী কহিল—এই নাও খাতা,

বাঁধিয়ে আনলুম। এই খাতায় সেই নতুন উপন্যাস চলবে—কেমন?

কুন্দ সাগ্রহে কহিল—এত মোটা খাতা! কত বড় বই হবে?

অবনী কহিল—রাম না হতে বাল্মীকি মুনি সাতকাণ্ড রামায়ণ রচেছিলেন। আমার এ-বই সাত-কাণ্ড না হোক, পাঁচ-কাণ্ডও হবে না? তিনশো পাতার কম বই হলে সে যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসবে না।

সারদা কহিলেন—তোদের ভালো খেলা হলো। তা, কুন্দ, আমি মা স্নান করতে চললুম। স্নান হলে আহ্নিক সেরে লুচিগুলো ভাজবো...তুমি ময়দা মেখে দিয়ো। সারদা স্নান করিতে গেলেন।

কুন্দ কহিল,—তিনশো পাতার বই হবে! এত কি লিখবেন?

অবনী কহিল—এখন কেন বলবো? তবে তিনশো পাতা করা চাই।...তোমায় একটা কাজ করতে হবে...

—কি কাজ?

অবনী কহিল—এর এই প্রথম পৃষ্ঠায় বেশ গোটা-গোটা অক্ষরে উপন্যাসের নাম 'সাহসিকা' কথাটুকু লিখে দাও।...এ কাজ তোমায় করতেই হবে।

লজ্জায় কুন্দর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। এ কল্পনার পিছনে সেও নিজের মনকে উদ্দাম বিচরণে পাঠাইয়াছে, কত বার এবং পাঠাইয়া দেখিয়াছে,—কি বৈচিত্র্য! তার নিজের কত আশা, কত সাধ সে-পথে কি মূর্ত্তিতেই না বিরাজ করিতেছে!

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া অবনী কহিল,—আমার latest plan তোমায় তবে বলি, শোনো...তোমার কাহিনীটুকু যেন তুমি বলচো, অর্থাৎ আমার কীর্ত্তিটুকু...তারপর আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা এবং তোমায় উদ্ধার করা—এ সব কথা আমি বলচি...এমনি ভাবে এ বই লেখা চলবে। বেশ এক রকম হবে! দুজনেরই লেখা শেষ হলে যদি দেখি পছন্দ-সই, তখন লেখকের নাম দেবো অবনী সেন ও কুন্দ দেবী প্রণীত। আর তা যদি না হয়, মিছে কেন তোমায় সমালোচকের রুদ্র রোষানলের সামনে দাঁড় করাই? নিজের নামেই বার করবো।

সলজ্জ মৃদু হাস্যে কুন্দ কহিল—আমি কিন্তু লিখতে পারবো না। লিখতে জানি না...

অবনী কহিল—হাতে কলম ধরে লিখতে হবে না। তবে গোড়ার কাহিনীটুকু আমায় আজ বলো...আবার! এখনই নয়—খাওয়া-দাওয়া চুকলে বিশ্রামের সময় বলো। এখনও ছাড়চি না। গোড়ার পাতায় নামটুকু তোমায় এখনি লিখে দিতে হবে। আমি মঙ্গলাচরণ সেরে পালা স্বরু করে দি। গোড়ার পরিচ্ছেদটুকু আমিই লিখবো কিনা!...দুপুর বেলায় যা লেখা হবে, সেটুকুর consultation চলবে।...তুমি এসো...

কুন্দ কহিল—বাজারের জিনিষগুলো গুছিয়ে রেখে আমি যাচ্ছি...আপনি এগোন।

অবনী কহিল—আগে তো এ-সব কাজ দাসী-চাকরে করতো...

কুন্দ কহিল,—আমি তা করতে দেবো কেন? মাও মানা করেছিলেন, আমি অনেক বলে-কয়ে এ কাজের ভার পেয়েচি। আমার সব শেখা চাই। আমার সাম্‌নে সারা জীবন পড়ে আছে। আজ এমন আশ্রয় পেয়েচি...কিন্তু কাল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো, তা যখন জানা নেই...

এ-কথায় কুন্দর অসহায়তা যে কি করুণ-মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল...! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অবনী কুন্দর দিকে অগ্রসর হইল। কুন্দর হাত নিজের হাতে লইয়া অবনী ডাকিল,—কুন্দ...

কুন্দ করুণ ম্লান দৃষ্টিতে অবনীর পানে চাহিল। অবনী কহিল—এ কথা কোন্ মুখে বললে! আমি কি কাল মরে যাবো? গণনায় দেখেচো?

কি কথায় কি কথা! কুন্দ যেন কাঠ! অবনী কহিল—আর কখনো এমন কথা যেন না শুনি। যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আশ্রয়ের জন্য তুমি ভেবো না। আমি মরে গেলে তখন এ দুঃখ করা সাজবে...

অভিমানে কুন্দ কহিল,—আমায় কেন ও-কথা বলচেন?... না...আমি কথা কবো না আপনার সঙ্গে!

অবনী কহিল,—আচ্ছা, আর বলবো না।...যা বলছিলুম,—তোমার সংসারের কাজ কতক্ষণে চুকবে? কখন ছুটী মিলবে?

কুন্দ কহিল,—পাঁচ মিনিটও লাগবে না। তারপর মার স্নান হলে, আহ্নিক হলে আমার ডাক পড়বে।

অবনী কহিল,—তাহলে পাঁচ মিনিট পরে এসো। আমি

বরং দাঁড়িয়েই থাকি, যতক্ষণ না তোমার কাজ চোকে! তারপর এই খাতার প্রথম পাতে তোমার লেখা নাম পড়লে আমার রচনা সুরু হবে।...

কুন্দ ধামায় আনাজ-তরকারী তুলিতে লাগিল। অবনী কহিল—এ বই তোমার নামেই উৎসর্গ করবো, স্থির করে ফেলেচি। তুমি শুধু খাতায় নাম-করণ করে দাও—তারপরই উৎসর্গটুকু লিখে ফেলবো।...

নবম পরিচ্ছেদ

খেলাধুলা

এমনি ভাবে লেখা সুরু করায় লেখায় উৎসাহ ও আনন্দ বাড়িল খুব। কিন্তু জানা বিবরণটুকু লেখা হইয়া গেলে মুস্কিল বাধিল। পরের পবিচ্ছেদগুলা ভাবিতে গিয়া অবনী মনের লাগাম ছাড়িয়া দেয়—তরুণ মন যা পায়, অবনীর তা লিখিতে বাধে। কাজেই লেখার গতি অচিরে মন্থর হইয়া পড়িল।

কুন্দ তাগিদ দেয়, বলে—লেখা এগোয় না কেন? ঐটুকু লেখা হতেই উৎসাহ নিব্‌লো?

অবনী হাসিয়া জবাব দেয়—তোমার জীবনে তেমন-কিছু ঘটলো না তো! এখানে এসে কুটনো কুটচো, ঘর গুচোচ্ছ—এ সব নিয়ে উপন্যাস লেখা চলে না।

কুন্দ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমার জীবনেঁ আপনি কি অঘটন ঘটাতে চান? ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বো? না, আগুনে ঝাঁপ খাবো? বলুন।

অবনী কহিল,—তা ঠিক নয়। তবে লেখার মত কিছু চাই তো!

কুন্দ কহিল,—আপনি কল্পনা করুন। আমার জীবন-চরিত লিখতে বসেন নি, আপনি লিখচেন উপন্যাস! কল্পিত ঘটনা নিয়েই উপন্যাসের সৃষ্টি। ঐ যে লিখেচেন, আপনার নায়িকা হেমনলিনী এসে বসন্তকুমারের বাড়ী আশ্রয় পেয়েচে...এটুকুতে আমার জীবনের ঘটনার সঙ্গে মিল আছে—বাকীটুকু গড়ে নিন্। না হলে আমার মৃত্যুর দিন অবধি আপনাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আমার জীবনে আরো কি ঘটে, তা দেখে তবে লিখবেন?

অবনী কহিল,—তাও বটে!

হাসিয়া কুন্দ কহিল,—আমার কি মনে হয়, জানেন?...এই অবধি বলিয়া কুন্দ আকাশের পানে চাহিয়া রহিল—যেন কোন্ স্বপ্নলোকের আভাস তার চোখের সামনে অস্পষ্ট আবছায়ায় জাগিয়া উঠিতেছে! অবনী কহিল,—কি মনে হয়?

কুন্দ কহিল,—শুনে যেন হাসবেন না!—আমার মনে হয়, বাল্মীকি মুনি চমৎকার কল্পনা করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী—দশরথের কাছে কৈকেয়ীর বর চাওয়া—তার ফলে অযোধ্যা ছেড়ে কোন্ বনে রাম-সীতা যাত্রা করলেন! সেখান থেকে পঞ্চবটী, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা, সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তারপর রাজ্যে ফেরা ...কতখানি বৈচিত্র্য! করুণ রসে রামায়ণের পাতা আগাগোড়া ভরে উঠেচে!...বলিতে বলিতে কুন্দর চোখ অপরূপ মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রামায়ণের সেই পঞ্চবটী, অশোক-বন যেন চোখের সামনে শ্যাম শোভায় জাগিয়া উঠিল।

কথাগুলা অবনীর ভারী ভালো লাগিতেছিল। তার মন এ কথায় সুদূর অতীতের কত দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল। অবনী কহিল,—সে ছিল ভারতের স্বর্ণযুগ। কবির মন সারা ভারতে ঘুরে বেড়াতো। এখন আমাদের চারিদিকে গণ্ডী টানা। কল্পনা-বেচারী এই কলকাতাতেই ঘুরে মরে—বড় জোর তাকে ঢাকা, কাশী, দিল্লী, আগ্রা পর্য্যন্ত দৌড় করানো চলে। তার ওদিকে সব অন্ধকার! কাজেই যে উপন্যাস খুলি, তাতেই দেখি, পাত্র-পাত্রীরা সেই মামুলি ভাবে মধুপুরে, নয় দেওঘরে হাওয়া খাচ্ছে, নয়তো এলাহাবাদের যমুনা-তীরে। খুব বেশী রোমান্স যেখানে ফোটে, সেখানে পূর্ণিমা রাত্রে আগ্রার তাজমহলে নায়ক-নায়িকাকে বসিয়ে দি!...এখন আর একটু scope বেড়েচে...নায়ক-নায়িকা বর্ম্মায় যেতে সুরু করেচে। কিন্তু যেখানেই যাক, কার্য্যবিধি সেই এক রয়ে গেছে!...তাই আমি ভাবছিলুম, এ-উপন্যাসে এমন একটা কিছু দিতে চাই, যা বাঙলা উপন্যাসে এ পর্য্যন্ত কেউ ছায় নি...

কুন্দ স্থির হইয়া কি ভাবিল; তারপর হাসিয়া কহিল,—তাহলে দেখচি, রাক্ষস-দৈত্য—এদের আনতে হয়—নয় তরুণ সাঁওতালীর সঙ্গে বাঙালী নায়িকার প্রেম...এমনি কিছু দিতে হয়!

—পাগল! তুমি আমার কথা ঠিক বুঝলে না! বলিয়া অবনী আকাশের পানে চাহিল।...

সারদা দেবী বাহির হইতে ডাকিলেন,—ও মা কুন্দ...

কুন্দ কহিল,—যাই মা...

কুন্দর যাওয়ার আগেই সারদা দেবী আসিলেন, আসিয়া কহিলেন,—কালীঘাটে যাচ্ছি। তুমি যাবে?

কুন্দ কহিল,—যাবো।...

সারদা কহিলেন,—তাহলে শীগ্‌গির তৈরী হও।

কুন্দ চলিয়া গেল। অবনী আকাশ-লোক হইতে মন ও চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিল, মার পানে চাহিয়া কহিল—ওকে নিয়ে কালীঘাটে যাবে?

সারদা কহিল,—যেতে চেয়েছিল।...কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করচিস্‌ রে?

অবনী কহিল,—ওকে কোনোখানে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, মা।

মার মনে উদ্বেগের সঞ্চার হইল। অবনী কহিল,—ধরো, যদি কোথাও সেই মামা বা তার কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হয়? তাহলে একটা বিভ্রাট বাধাতে পারে তো! আমার অনেকবার মনে হয়েচে, একা থাকে, বায়োস্কোপ দেখতে নিয়ে যাই একদিন। শুধু ঐ ভয় হয়। অবশ্য ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে না—তবে একটা হাঙ্গাম বাধাতে পারে—পাঁচজনের সামনে। পাঁচজনে মনে মনে পাঁচ রকম কাহিনী গড়ে টিটকারী-বিদ্রূপের সৃষ্টি করতে পারে!...

কথাটা মা ভাবিলেন, ভাবিয়া কহিলেন,—কথা মিথ্যে নয় বাবা। সেদিন আমার সঙ্গে গঙ্গা নাইতে গেছলো...নাওয়া সেরে

মদনমোহন দেখতে গেলুম—কুন্দ আমায় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে,—মা গো, মামার মত কাকে যেন দেখলুম! আমার গা অমনি ছম্‌ছমিয়ে উঠলো। ভাগ্যে ভুল দেখেছিল। সত্যি মামা-মিন্সে দেখলে কি হতো? আমার কাছ থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিল না!

অবনী কহিল—আমি তাই ভাবি, বেচারীকে বন্দিনীর মতই আপাততঃ থাকতে হবে কিছুকাল...

সারদা দেবী কহিলেন,—ওর বিয়ের একটি পাত্র ছাখ্ বাবা। আমিও দু'চারজন ঘটকীকে সন্ধান নিতে বলেচি। তুইও চেষ্টা ছাখ্। তোর বন্ধু-বান্ধব কেউ এমন নেই? মেয়েটা জীবনে যাতে আরাম পায়, এমন পাত্র ছাখ্।...পরের দায় ঘরে এনেচি—তার হিল্লে আমাকেই দেখতে হবে।...

এ কথায় অবনীর মনের কোন্ গোপন কোণে একটু বেদনা সাড়া দিয়া উঠিল। কুন্দর বিবাহ! এই কুন্দ পরের ঘরে চলিয়া যাইবে...এই হাসি-খেলার স্নিগ্ধ ধারা! কিন্তু মেয়ে...তার বিবাহ দিতেই হইবে!...সত্যই তো, তার খেলার সঙ্গিনী হইয়া এ-ভাবে তার জীবন কাটিতে পারে না!

অবনী কহিল—চেষ্টা দেখবো। কিন্তু আমি ভাবছিলুম...

মা কহিলেন,—কি?

অবনী কহিল—ওকে লেখাপড়া শেখাও, মা। স্কুলে দাও...পাশ-টাশ করুক।

মা কহিলেন—বাঙালীর মেয়ে—পাশ করে কি হবে? ওর যদি

জলে পড়া অবস্থা হতো, তাহলে পয়সা-রোজগারের জন্য সে-উপায় দেখতে হতো।

অবনী কহিল,—পাশ করার কি তাই উদ্দেশ্য, মা ?

মা কহিলেন,—না বাপু, তুই ওর বিয়ের চেষ্টা গ্যাখ্। নিজের মেয়ে হলেই ভাবনার অন্ত থাকে না—এ পরের মেয়ে।...

—কে পরের মেয়ে, মা ? বলিতে বলিতে কুন্দ ফিরিল।

মা কহিলেন,—পরের মেয়ে বলেচি, মা—পর বলিনি !...

কুন্দ কহিল,—চলুন। আমি তৈরী।

মা কহিলেন—না মা, তোমার যাওয়া হলো না! অবু বারণ করচে।

কুন্দ অবনীর পানে চাহিল। অবনী কহিল—তোমার ও ভিড়ে যাওয়া হতে পারে না, কুন্দ! বিশেষ, মার সঙ্গে !

—কেন ?

অবনী কহিল—কারণ তোমায় পরে বুঝিয়ে বলবো। আপাততঃ শুধু জেনে রাখো, তোমার যাওয়া বন্ধ !

—বা রে! একটু ফাঁকা হাওয়ায় ঘুরে আসতুম। তাছাড়া ঠাকুর দেখা হতো...

অবনী কহিল—না।

মা কহিলেন—কারণ আছে মা। অবুর কাছে শুনো।... আমি তাহলে দেরী করবো না। আসি।...তোমরা বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করো।...

মা চলিয়া গেলেন। ও-বাড়ীর মোক্ষদা ঠাকুরাণী, বজুর মা

নীচে অপেক্ষা করিতেছিলেন—মা গিয়া তাঁদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী চলিয়া গেল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া কুন্দ দেখিল।

গাড়ী চলিয়া গেলে কুন্দ ঘরে ফিরিয়া অভিমানের সুরে কহিল—আমায় যেতে দিলেন না! কেমন ঘুরে আসতুম!...

—হুঁ! বলিয়া অবনী মৃদু হাসিল।

কুন্দ কহিল—আমায় খাঁচার পাখী করে রাখবেন! আমার বুঝি একটু পথ-ঘাট দেখার সাধ হয় না?...কুন্দ মুখ বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অবনী ডাকিল,—কুন্দ...

কুন্দ কহিল—কেন?

অবনী কহিল—সেদিন মদনমোহন দেখতে গেছলে?

—গেছলুম তো! ভাগ্যে বাড়ী ছিলেন না—থাকলে বোধ হয় তাও যেতে দিতেন না!

—না।

—কেন?

অবনী কহিল,—তোমার মামার মত কাকে দেখেছিলে সেখানে—না?

—হ্যাঁ।

—যদি সে সত্যি মামা হতো? তোমায় টানা-হ্যাঁচড়া করতো যদি অত লোকের ভিড়ে...?

সে কি বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিত, ভাবিয়া কুন্দ শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল—তা ঠিক...

অবনী কহিল—এই জন্মই বারণ করলুম। মেয়েদের সঙ্গে যাওয়া...ওঁদের কি সাধ্য থাকবে তোমায় উদ্ধার করা!... আমি নিজেও সে সাহস করিনে। নাহলে তোমায় নিয়ে বায়োস্কোপে যেতে পারতুম...আমার কত বার মনে হয়েচে...

কুন্দ কহিল—নিয়ে যাবেন? চলুন,—কত বছর দেখিনি!... আপনার সঙ্গে যাবো। কোনো ভয় নেই—আমি খুব হুঁশিয়ার থাকবো। লক্ষ্মীটি...

স্বরে ও দৃষ্টিতে মিনতি ভরিয়া কুন্দ অবনীর দুই হাত ধরিল।

অবনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—বেশ, চলো, আজই যাই!...সন্ধ্যায় সাড়ে ছটার শো।...এলফিনষ্টোনে, কিম্বা, গ্লোবে। এ-পাড়ায় যাবো না...

কুন্দ কহিল—বেশ। এ কথা পাকা?

—পাকা।

নৃত্য-ভঙ্গীতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া কুন্দ কহিল—আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ!

অবনী তার পানেই চাহিয়াছিল, কুন্দর ভঙ্গী দেখিয়া অবনীর আনন্দ হইল। ভারী সরল...বালিকার মত সরল! সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে তার শিশুর সারল্য আজও ঝরিয়া যায় নাই!...

আহারাদি সারিয়া অবনী বাহিরে গিয়াছিল,—ফিরিল বেলা

তখন পাঁচটা। কুন্দ তার পথ চাহিয়া ঘর-বাহির করিতেছিল... অধীরতার সীমা ছিল না!

অবনী ফিরিতে সে শরবৎ আনিয়া সামনে ধরিল। অবনী তখন বাদামী কাগজে মোড়া মস্ত একটা বাণ্ডিল খুলিতেছিল। কুন্দ কহিল—আগে এটুকু খান্ তো...

অবনী কহিল—দাঁড়াও না, এক মজা দেখাই।

কুন্দ কহিল—মজা আমি দেখতে চাই না।

অবনী কহিল—দেখতেই হবে।...

বাণ্ডিল খুলিয়া অবনী তার মধ্য হইতে নাগরা জুতা, মাদ্রাজী শাড়ী, শেমিজ প্রভৃতি বাহির করিয়া কহিল—এগুলো নাও...এই পরে বায়োস্কোপে যাবে...

নাগরা জোড়ায় পা ঢুকাইয়া কুন্দ কহিল—বা রে, পায়ে ঠিক হয়েচে একেবারে! ঠিকঠাক্ মাপ পেলেন কি করে?

—বলো দিকিন্...

—জানি না। বলুন না—আন্দাজে...না?

—আন্দাজ অত ঠিক হলে কি ভাবনা ছিল!...এই ছাখো... বলিয়া পকেট হইতে ভাঁজ-করা একখানা সাদা কাগজ অবনী বাহির করিল। ভাঁজ খুলিতে কুন্দ দেখে, পেন্সিলে-ছকা পায়ের মাপ! বিস্ময়ে কুন্দর দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

কুন্দ কহিল,—এ কোথায় পেলেন?

অবনী কহিল,—ম্যাজিক! আমার উপন্যাসের আলাদীন এনে দিয়েচে...

—না, সত্যি বলুন...বলতেই হবে আপনাকে!

অবনী কহিল,—মার ঘরে দুপুর-বেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে—মনে আছে?

কুন্দ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নিমেষের জন্য কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল—মার কাছে বসে তাঁকে বই পড়ে শোনাচ্ছিলুম—তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন—আমারো কেমন তন্দ্রা এলো...

অবনী কহিল,—সেই সময় আলাদীনের সেই দৈত্যকে আনিয়েছিলুম। সে অমনি একখানি সাদা কাগজ এনে তোমার পায়ের তলায় ধরে পেন্সিলের লাইন কেটে পায়ের ছাপটুকু তুলে নিলে সে কাগজে...

ভ্রূকুটি ভঙ্গী করিয়া কুন্দ কহিল,—যান্, আপনি ভারী দুষ্টু! কেন বলুন তো আমার পায়ে হাত দিলেন! ছি ছি...আমার পাপ হলো! আমায় বললে কি আমি মাপ দিতুম না?

কথাটা বলিয়া কুন্দ আঁচল টানিয়া গলায় জড়াইল, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া অবনীর পায়ের কাছে প্রণাম করিল; পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় মুখে বুলাইয়া কুন্দ কহিল,—আর কখনো এ-কাজ করবেন না। গুরু-জন আপনি...

অবনী কুন্দর দুই হাত ধরিয়া তাকে কাছে টানিয়া কহিল,—গুরু-জন, গুরু আমি? মন্ত্র পড়ে তবে বলো...অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ—এই কথা বলে গুরুকে প্রণাম করতে হয়, বুঝলে?

দশম পরিচ্ছেদ

দোলা

বায়োস্কোপে ভালো ছবিই ছিল। গরীব-দুঃখীর কাহিনী। নালা-নর্দ্দামার পাঁক সাফ করিয়া বেড়ায় ধাঙ্গড়ের দল। তাদের সর্দ্দার এক তরুণ যুবা। ধাঙ্গড় হইলেও তার চাল-চলন বেশ ভদ্র। তারপর দেখা দিল এক বিলাসিনী নারী জেনি, আর তার বোন্ ফ্যানি। ধনী আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় মিলিবে, তাই বিলাসিনী তার বোনকে সাজাইয়া দিতেছে...কিন্তু বোনের এ সাজ ভাল লাগে না। দিদি বকে। শেষে ছোট বোন কোনো মতে ঘর ছাড়িয়া পলাইল। তারপর ঐ তরুণ ধাঙ্গড় কি আশার কিরণে চারিদিক ভরিয়া তুলিল! কি প্রীতি; কি আনন্দ! ইন্‌টারভালের সময় কুন্দ মৃদু স্বরে কহিল,—ওদের সমাজে মানুষের কোন্‌খান থেকে কোথায় ওঠবার সম্ভাবনা, দেখুন। এই সংসর্গ...ভালো হলে ও-ও স্বর্গে স্থান পাবে!...

অবনীর মন সেদিকে ছিল না। ইন্‌টারভালে আলোর মালায়

ছবি-ঘর জাগিয়া উঠিতে সে বিচিত্র দর্শকদলের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেছিল—কত বেশে কত নর-নারীই না আসিয়াছে! দেখিতে দেখিতে চোখ পড়িল...এ কি! নির্ম্মলা? তার পাশে গিরীন, শ্রীধর, অজিত। ঠিক। নির্ম্মলার পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। তার খবর সে লয় নাই! এদিকে কুন্দর সঙ্গে নানা গল্পে সময় কাটাইয়া চলিয়াছে!...কাণের কাছে কুন্দর গল্পের আলোচনা সমানে চলিয়াছিল...অবনী শুধু হাঁ-হুঁ করিয়াই সায় দিতেছিল।...নির্ম্মলা ও গিরীন যেন তর্ক তুলিয়াছে—শ্রীধর ও অজিত কখনো মাথা নাড়িয়া, কখনো হাসিয়া সে তর্কে যোগ দিতেছে।...

অবনী ডাকিল,—কুন্দ...

কুন্দ তখনো তার আলোচনার জের লইয়া ব্যস্ত। সে কহিল,—না, আমায় বলুন আগে...আমার কথা ঠিক কি না?

অবনী অপ্রতিভ হইল। সে কুন্দর কথা শোনে নাই, কি জবাব দিবে? অবনী কহিল,—বাড়ী ফিরে তর্ক লাগিয়ো। এখন আমি যা বলি, শোনো...

—কি?

—আমার এক বন্ধু তাঁর বোনকে নিয়ে বায়োস্কোপে এসেচেন। বোনের নাম নির্ম্মলা...এবারে বি-এ এগ্জামিন দিয়েচে। ওঁদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো, বায়োস্কোপ ভাঙলে।

কুন্দ জড়ো-সড়ো হইয়া কহিল,—ওরে বাবা, বাঙালীর মেয়ে

বি-এ পাশ ! আমি ওদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবো না, তা আলাপ করবো !

অবনী কহিল,—কোনো ভয় নেই। ভালো লাগবে তোমার ...তখন দেখো। তাছাড়া তোমাকেও শীগ্‌গির স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবো।...

কুন্দ সে কথার জবাব না দিয়া কহিল,—তাঁরা কোথায় ?

অবনী নির্ম্মলার দিকে চাহিয়া কহিল,—ঐ ও-পাশের সেকেণ্ড লাইনে...ওই লাল ফ্রক-পরা এক মেম সিগারেট খাচ্ছে—মুখখানা লম্বা—তার ঠিক পাশে একটি বাঙালী ভদ্রলোক...উনি গিরীন—ওঁর পাশে পেঁয়াজী রঙের শাড়ী পরা মেয়েটি—কোঁকড়া চুল... উনি নির্ম্মলা।...

অবনীর নির্দ্দেশ-মত দৃষ্টি চালনা করিয়া কুন্দ কহিল—ঐ যিনি ও-পাশের বাঙালীকে কি বলচেন ?

—হ্যাঁ।

—ওঃ! বলিয়া কুন্দ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে নির্ম্মলার পানে চাহিয়া রহিল।...

ও-দিকে ঘণ্টা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘর অন্ধকার করিয়া পর্দ্দার উপর আবার নর-নারীর মনের লীলা ছবিতে ফুটিল।...

বায়োস্কোপ ভাঙ্গিলে ভিড়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া বাহিরে আসিয়া অবনী দেখে, গিরীনরা সদলে অদৃশ্য হইয়াছে।... অবনী একটু দাঁড়াইল—কিন্তু বৃথা।...তখন সে ট্যাক্সি ডাকিবার

উদ্দেশ্যে কুন্দকে কহিল,—তুমি এখানে একটু দাঁড়াও। আমি একখানা ট্যাক্সি ধরি।

কুন্দ কহিল,—চলুন না, হেঁটে মাঠ অবধি যাই। ছেলেবেলায় ঐ মাঠে কত এসেচি। এখনি গাড়ী নাই নিলেন! মাঠে একটু পায়চারি করে ধর্ম্মতলার মোড়ে নয় গাড়ী নেবেন...

অবনী কহিল,—বেশ!...

তাই হইল। দুজনে হাঁটিয়া গ্রাণ্ড হোটেলের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। পথে মোটরের ভিড়। পুলিশ হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া—গাড়ীগুলা তার নির্দ্দেশে কখনো চলিতেছে, কখনো থমকিয়া দাঁড়াইতেছে।

অবনী কুন্দর হাত নিজের হাতে ধরিয়া কহিল,—দাঁড়িয়ে থাকলে রাত দুটো অবধি বোধ হয় পথ পার হতে পারবো না। আমি তোমার হাত ধরচি—চলে এসো...

পথ পার হইতে গিয়া মাঝখানে বাধা পড়িল। এক দিকে পুলিশ গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে—অপর দিক বন্ধ। আলোয় উজ্জ্বল পথ। একটু ফাঁক মিলিতে কুন্দর হাত ধরিয়া তাকে এক রকম টানিয়া অবনী দ্রুত রাস্তা পার হইল—সঙ্গে সঙ্গে পিছনে আহ্বান উঠিল,—অবনী...

পশ্চিমে মাঠের ধারে আসিয়া অবনী ফিরিয়া চাহিল। কে ডাকে?...গাড়ী চলিতেছে—একখানা মোটরে দেখে, গিরীন, নির্ম্মলা...

নির্ম্মলার দৃষ্টি তাদের উপর। হাসিয়া অবনী হাত তুলিল।

নির্ম্মলাদের মোটর ওদিকে মুক্ত পথ পাইয়া বিদ্যুতের গতিতে দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চকিতের ঘটনা! দু'মিনিট বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া অবনী একটা নিশ্বাস ফেলিল; তারপর কহিল—ওরা আগেই বেরিয়ে পড়েছিল—চলে গেল।

কুন্দ কহিল,—ওঁরাই ডাকছিলেন...?

—হ্যাঁ।...

দু'জনে পায়ে হাঁটিয়া মাঠের উত্তর প্রান্তে আসিল। বাঁয়ে সেই গাছ...গাছের নীচে বেঞ্চ। কুন্দ কহিল,—ঐ বেঞ্চে একটু বসবেন? দিব্যি হাওয়া!

অবনী কহিল,—বেশ, বসি চলো।...

সেই বেঞ্চ! যে বেঞ্চে বসিয়া সেই পুরানো ইংরেজী নভেল হাতে সে তার সাহিত্য-জীবনে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিল, তারপর গিরীন আসিল, সঙ্গে নির্ম্মলা। নির্ম্মলার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় এই বেঞ্চে!

দু'জনে বেঞ্চে বসিল। দুজনেই স্তব্ধ। কাহারো মুখে কথা নাই। অবনী নির্ম্মলার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়ের কথা ভাবিতেছিল। আর কুন্দ ভাবিতেছিল, বায়োস্কোপের ছবির কথা,—ছবির নায়িকার ভাগ্যের সহিত নিজের ভাগ্য মিলাইয়া সে মনে মনে কত-যে স্বপ্ন রচিতেছিল!...

অবনী ভাবিতেছিল, নির্ম্মলার সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়, তারপর তাদের গৃহে সেই নিমন্ত্রণ...সেই রাত্রেই কুন্দ যেন আকাশের

ঝরা-তারার মত আসিয়া উদয় হইল! নির্ম্মলা আর কুন্দ...
বড় ভালো মেয়ে দুটি!...আচ্ছা, দুজনের মধ্যে...? কিন্তু না,
কেন এ-বিশ্লেষণ? এ তুলনার কি তাৎপর্য্য? জোর করিয়া
অবনী নিজের মনকে ফিরাইল, ডাকিল,—কুন্দ...

কুন্দ একটা নিশ্বাস ফেলিল। অবনী কহিল—নিশ্বাস
ফেললে যে—কি ভাবছিলে?

—অনেক কথা!

—বলো, শুনি।

কুন্দ অবনীর পানে চাহিল। অবনী সস্নেহে কহিল—
বলো...

কুন্দ কহিল—ছবিতে দেখলুম—ঐ মেয়েটি...কি বিশ্রী আব-
হাওয়ায় মানুষ হচ্ছিল—তারপর পথে ঐ নায়কের সঙ্গে
দেখা...জীবনে কতখানি ঝড় এলো...মানুষ সে ঝড়ের দাপট
সয়েও বেঁচে থাকে!

অবনী কহিল—ভাগ্যে বেঁচে ছিল। তাই শেষে অত সুখ
তার অদৃষ্টে ঘটলো...! বেচারী তো জলে ডুবতে গেছলো! হঠাৎ
মনের গতি যদি না ফিরতো? নায়ক চার্লিও তাহলে যেতো—
দু-দুটো জীবন। শত ব্যথা সয়ে শেষে কি সুখে না সুখী
হলো!...আচ্ছা, ছবিখানা দেখে কি বুঝলে, বলো তো?

—কি বুঝলুম, মানে?

—শিক্ষা বলো, moral বলো...যা খুশী বলো—গল্প-
উপন্যাসে একটা message বা বাণী প্রায় থাকে। অবশ্য

moral যে থাকতেই হবে, তা বলচি না। তবু পরের সুখ-দুঃখ থেকে আমরা বহু শিক্ষা পাই বৈ কি। এ ছবিখানি থেকে আমরা এইটুকু বুঝি যে, বিপদে আত্মহারা না হওয়া, ধৈর্য্য ধরে সব সয়ে থাকা উচিত। নয়?...কে জানে, আমার মনে হয়, নিছক দুঃখ বা নিছক বেদনা মানুষকে সইতে হয় না—সুখ আর দুঃখ পৃথিবীতে পর-পর-ধারায় বয়ে চলেছে!...

কুন্দ কহিল—ও তো মানুষের রচা গল্প!...সত্যকার জীবনেও কি তাই ঘটে? দুঃখী যে, আজীবন সে দুঃখই ভোগ করে, দেখি।

অবনী কহিল—তা বোধ হয় নয়, কুন্দ। বিধাতা নিশ্চয়ই আমাদের নভেলিষ্টদের চেয়ে কম অকরুণ নন্!

কুন্দ একাগ্র মনে অবনীর কথা শুনিতেছিল। মাঠের দিকে-দিকে পথে-পথে গ্যাসের আলোগুলা যেন আলোর ফুলের মত ফুটিয়া আছে! পথে গাড়ী চলিয়াছে—লোক চলিয়াছে। দিনের কাজের শেষে বিশ্রামের সুর সহরের বুক বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে!...কুন্দ ভাবিতেছিল, নিজের কথা। আজ বিপদে পড়িয়া অবনীর গৃহে সে আশ্রয় পাইয়াছে...এর পর? এ আশ্রয়ে চিরদিন কাটিবে না, নিশ্চয়। কে এমন ভার লইবে? শুধু অন্নের ভারই নয়। সে নারী—নারীর সম্বন্ধে বিধানের অন্ত নাই! এই সেদিনই মা বলিতেছিলেন,—চোখ বোজার আগে তোমায় কোনো ঘরে থিতু করে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হবো।...

কোনো ঘরে তার থিতু হওয়া চাই! এ কথায় মার চিন্তারই পরিচয় পাইয়াছে। মা তো এ কথা বলিতে পারিলেন না, আমি

গেলেও অবু থাকিবে, সে তোমার ভার লইবে!...তা বলা চলে না—কেন না, সে পর, সে নারী!

সেই কথাই মনে জাগিতেছিল! নিশ্চিত আশ্রয় ছাড়িয়া কোথায় কোন্ অনিশ্চিতের রাজ্যে ছুটিতে হইবে! কেন এমন হয়?...যেমন আছে, এমনি তাকে থাকিতে দিলে কার কি ক্ষতি!...

এ সব ভাবনার সীমা নাই। কত ভাবিবে? নিশ্বাস ফেলিয়া কুন্দ অবনীর পানে চাহিল, কহিল,—আরো বসবেন?

অবনী কহিল—চলো, উঠি

দুজনে উঠিল। সামনে পথে ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে চড়িয়া সেই গৃহ।...

মা বলিলেন,—তোর কে বন্ধু আছে, গিরীন...এসেছিল রে।

অবনী কহিল—তার পর?

মা কহিলেন—চাকররা বললে, তুই বায়োস্কোপে গেছিস।

অবনী কহিল—আবার আসবে কি না, কিছু বলে গেছে?

মা কহিলেন—হ্যাঁ। কাল সকালে না কি আসবে...কি কাজ আছে।

অবনী কোনো কথা না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল।... নির্মলা তাকে দেখিয়াছে—কুন্দর সহিত। তাই বোধ হয়, কৌতূহল। তার মনের মধ্যে একটু ছায়া পড়িল। কিন্তু কেন এ ছায়া?...অবনী তার কোনো কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না।

বেশভূষা-ত্যাগ করিয়া কুন্দ আসিয়া কহিল,—চুপ করে বসে আছেন যে! জামা ছাড়ুন। রাত কম হয়নি!

অবনী কুন্দর পানে চাহিল।

কুন্দ কহিল—জামা ছাড়ুন, ছেড়ে স্নান করতে হয় করে নিন্। খাবার সময় হয়েচে। ঠাকুর ready.

অবনী কহিল—স্নান করবো না। মুখ-হাত ধুয়ে ফেলি। তুমি খাবার দিতে বলো।...

আহারাদির পর অবনী নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। গিরীন কেন আসিয়াছিল? একটু যদি লিখিয়া রাখিয়া যাইত। মন কেমন অধীর হইয়া উঠিল। নির্ম্মলা, গিরীন—ইহাদের কথা সত্যই ক'দিন ভুলিয়া ছিল। নির্ম্মলা কেমন এগজামিন দিল, সে সংবাদটুকু লওয়া উচিত ছিল!...কিন্তু গিরীন কেন আসিল? এমন কি কাজ? পথে যখন তাকে দেখিল, মোটর থামাইয়া অনায়াসে বলিতে পারিত!...হয়তো কুন্দ সঙ্গে ছিল বলিয়াই...

কিন্তু তাহাতে কি? কুন্দ এমন কিছু বোর্খায় মুখ ঢাকিয়া পথ চলিতেছিল না। তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলে মস্ত অপরাধ হইত?...মন বলিল—একবার না হয় চলো...শুনিয়া এসো!...কিন্তু সঙ্কোচ...এত রাত্রে হঠাৎ হুম্ করিয়া গিয়া হাজির হইবে? তার চেয়ে একটু ধৈর্য্য—রাত্রিটা বৈ নয়! কাল সকালে গিরীন আবার আসিবে বলিয়া গিয়াছে!

কুন্দ আসিল, আসিয়া কহিল—বসে আছেন শুধু শুধু!

ঘুমিয়েও পড়েন নি, দেখচি। লিখচেন না কিছু ? এ কি বিচিত্র ব্যাপার !

অবনী কুন্দর পানে চাহিল। হাস্যময়ী কুন্দ ! কুন্দ কহিল—মশারি ফেলে দিয়ে যাই ? না, এখন শোবেন না ? লিখবেন ?

অবনী কহিল—না, আজ আর লিখবো না। বেদব্যাসের আজ বিশ্রাম।

কুন্দ কহিল—কাল এক কাজ করবেন ?

—কি ? কুন্দ কহিল—শিবপুরের বাগানে যাবেন...? মা বলছিলেন...আমারো ভারী ইচ্ছা হয়েচে। একদিন বাইরে বেরিয়েই লোভ বেড়ে গেল ! যাবেন ?

অবনী কহিল,—তথাস্তু !...

কুন্দ মশারি ফেলিয়া চলিয়া গেল। অবনী আলো নিবাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।...

চোখে ঘুম আসিল না। উপন্যাসের প্লট্, কুন্দ, নির্ম্মলা, হালের কথা-সাহিত্য...ভিড় করিয়া মাথাটাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিল না। ভিড় সরাইয়া চিন্তার একটি সূত্র ধরিতে যায়, অমনি কত চিন্তা আসিয়া জড়ো হয়। কুন্দ যে তাদের গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে নিয়তির কোনো ইঙ্গিত নাই ? অবনী যদি সে-রাত্রে ঘুমে অচেতন থাকিত ? গাড়ীখানা এ গলির মধ্যে যদি না ঢুকিত ? ধাক্কা খাইয়া উল্টাইয়া না যাইত ? কুন্দ তাহা হইলে... তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কুন্দর ভবিষ্যৎ তাহা হইলে কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, কে জানে !...তার লেখা পড়িতে কুন্দর ভালো

লাগে ! সর্ব্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তার লেখা লইয়া আলোচনা করে...লেখাপড়াও জানে। বিলাতে লেখকেরা সেক্রেটারি রাখেন ! এবং সেই সেক্রেটারির সঙ্গে একদিন লেখকের ভাগ্য বিজড়িত হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয় ! কুন্দর ভাগ্য যদি...

সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। ছি,—এ কি বদ্ চিন্তা মাথায় আসিয়া উদয় হয়। লোকে উপন্যাসে এমনি কথা কল্পনা করে বলিয়া তাব রাগ ধরে, আব সে নিজে সত্যকাব জীবনে এমন উদ্ভট চিন্তার প্রশ্রয় দিতেছে।...

কুন্দ তাকে ভালোবাসে ? তাই, নহিলে...হয়তো এ কৃতজ্ঞতা। তাছাড়া বোন ভাইকে ভালোই বাসে।—না, ও চিন্তা নয়। কুন্দর এ সে-ভালোবাসা নয়—তা হইলে কুন্দর অমন সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব থাকিত না—সলজ্জ কুণ্ঠায় সে সর্ব্বক্ষণ জড়োসড়ো থাকিত। তাছাড়া...

নির্ম্মলা।...আকাশ-কুসুম রচনা কবা ছাড়া কি কাজ নাই ? মনকে সে শাসাইল। না, কোনো চিন্তা নয় ! ঘুম ! দুই চোখ বুজিয়া এখন ঘুমের আরাধনা...নির্ম্মলা ও কুন্দ সুখে থাকুক, স্বচ্ছন্দ মনে জগতের পথে বিচরণ করুক...তাদের লইয়া এমন সব উদ্ভট চিন্তায় অবনী তাদের অপমান করিবে না !

মনের সঙ্গে এমনি বোঝা-পাড়ায় বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে কখন্ এক সময় বুঝি তার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া ঘুম আসিয়া সত্যই দুই চোখের পাতায় আসন পাতিল।...

আবার যখন চোখ মেলিয়া চাহিল, তখন অবনী দেখে,

সকালের রৌদ্র ঘরের দেওয়াল বহিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। গিরীনের কথা সকলের আগে মনে জাগিল... গিরীন আসিবে বলিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া সে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথায় ব্রাশ্ চালাইয়া মানুষের মত হইল। কুন্দ আসিয়া পলকে দেখা দিল, তার হাতে চায়ের পেয়ালা আর মোহনভোগের রেকাবি।

কুন্দ কহিল,—মা বললেন, সকাল-সকাল খেয়ে নিতে হবে আজ। যে কাজে যেখানেই যান্, ফিরে বেলা দশটায় খাওয়া চাই। আপনার খাওয়া হলে মা খেতে বসবেন,—বেলা বারোটা বাজবার আগে শিবপুরে বেরুতে হবে।

শিবপুরের বাগান! ঠিক! অবনী কহিল—তাই হবে, মাকে বলো! আমার বেরুবার দরকারও আজ নেই। একটি বন্ধুর আসবার কথা আছে, সকালেই।

কুন্দ কহিল,—তাহলে চা খেয়ে লেখাটা নিয়ে বসুন না একটু। সত্যি, আমার ভারী কৌতূহল হচ্ছে। নিজের ভাগ্যে বিধাতা কি লিখেচেন, জানি না—জানবার উপায় নেই—তাই আপনার হাতে কল্পনার তুলিতে যেটুকু গড়ে ওঠে, সেটুকু দেখার লোভ কোনোমতে সামলাতে পারচি না।

হাসিয়া অবনী কহিল,—তা যদি বলো কুন্দ, তাহলে কলমের একটি টানে তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ ছকে দিতে পারি। সে-ছত্র সোনালি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবার মত।

সকৌতূহলে কুন্দ কহিল,—কি রকম?

অবনী কহিল,—দেখবে ?

হাসিয়া কুন্দ কহিল,—দেখি।

চায়ের পেয়ালা রাখিয়া প্যাড হইতে একখানা কাগজ টানিয়া অবনী তাহাতে দুটি ছত্র লিখিল, লিখিয়া কুন্দর সামনে ফেলিয়া দিল। কুন্দ হাসি-মুখে কাগজখানা তুলিয়া পড়িল। অবনী লিখিয়াছে—

তারপর কুন্দর দুষ্টামি বাড়িয়া উঠিল। তখন অবনীরা একটি ভালো পাত্র ধরিয়া সেই পাত্রের হাতে কুন্দকে সঁপিয়া দিল। পাত্র কুন্দকে মাথায় করিয়া গৃহে লইয়া গেল। এবং তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ কাল স্বামীর আদরে আদরিণী কুন্দ পরম-সুখে গৃহ-সংসার করিতে লাগিল।

দুই চোখে ভ্রূকুটি ভরিয়া কুন্দ অবনীর পানে চাহিল। কৃত্রিম রোষে-ভরা স্বরে কুন্দ কহিল—যান্! ভারী লেখক হয়েচেন! এ বুঝি গল্প হলো? একে বলে সুবচনীর কথা!

বলিয়াই সে অবনীর দিকে কাগজখানা ছুড়িয়া গমনোদ্যত হইল। তার হাত ধরিয়া অবনী কহিল—সুবচনীর কথার তুলনা আছে? কত হাজার হাজার বছর ধরে লোকের মুখে-মুখে এ-কথা চলে আসচে, বলো তো!...আর আমাদের এ গল্প? এক এডিশন কাটাতে বাই জন্মে যাবে!...

—যান্, আমি আপনার সুবচনীর কথা শুনতে চাই না! বলিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া কুন্দ বিদায় লইল।

হাসিয়া অবনী লেখায় মনঃ-সংযোগ করিল। ভৃত্য আসিয়া হাতে চিঠি দিল। গিরীন লিখিয়াছে,—একটু কাজ পড়িয়াছে, তাই যাইতে পারিলাম না। তুমি একবার দশ মিনিটের জন্য আসিতে পারো?

চিঠি পড়িয়া অবনী গায়ে জামা দিয়া গিরীনের বাড়ী চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হৃদয়-রহস্য

গিরীনের বাড়ী গিয়া অবনী দেখে, বাহিরের ঘরে গিরীন একা বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে। অবনী কহিল—ব্যাপার কি, বলো তো? কাল রাত্রেই গিয়ে হাজির...

গিরীন কহিল,—একটু কাজ আছে। কিন্তু তার আগে... হ্যাঁ—কাল তুমিও বায়োস্কোপে গেছলে?

অবনী কহিল,—গেছলুম।

গিরীন কহিল,—এলফিনষ্টোনে?

—হ্যাঁ।

গিরীন কহিল,—আমি দেখিনি। নিমু দেখেছিল। ছবি শেষ হলে যখন উঠচি, তখন বললে। ফটকের সামনে এসে দেখি, সামনে মোটর দাঁড়িয়ে। কাজেই দাঁড়াতে পারলুম না। তারপর দেখি, চৌরঙ্গীতে তুমি রাস্তা পার হচ্ছো। নিমু প্রথমে দেখে। আমি দেখবা মাত্র তোমাকে ডাকলুম...

অবনী কহিল,—সে ডাক শুনে দাঁড়াবার উপায় ছিল না।

রাস্তা পেরিয়ে ফিরে আমি দেখি, তোমাদের গাড়ী বেরিয়ে গেল।

—সঙ্গে একটি মহিলা ছিলেন ? বোন্...না...?

অবনীর বুকটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বুঝি, বয়সের ধর্ম্ম বলিয়া যে কথা আছে, তারি জন্য ! একটা ঢোঁক গিলিয়া অবনী কহিল—বোন্ ঠিক নয়...মানে, এর মধ্যে একটু...

হাসিয়া গিরীন কহিল,—রোমান্স ?

অবনী কহিল,—রোমান্স বলতে পারো। মানে, বেশ একটু বিচিত্র ইতিহাস...

গিরীন কহিল,—প্রকাশ-যোগ্য ?

অবনী কহিল,—নিশ্চয়।

অবনী কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না রাখিয়া সবিস্তারে কুন্দর ইতিহাস বর্ণনা করিল। শুনিয়া গিরীনের বিস্ময়ের সীমা নাই।

সে কহিল—বলো কি হে! উপন্যাসেই তো এমন ঘটনা ঘটে...তা'ও উপন্যাস-লেখক গাড়ী ওল্টানোর ঘটনা লিখতে বোধ হয় ভয় পায়, পাছে পাঠক-পাঠিকার মনে সংশয় জাগে! তারা ভাবে, গাঁজা!

অবনী কহিল,—সাধে মহাকবি লিখে গেছেন, There are more things in Heaven and Earth than are dreamt of in your philosophy.

গিরীন কহিল,—তা বটে!...বসো। আমি নিমুকে খবর দিয়ে আসি। সে আমায় বলছিল...মেয়ে-মানুষের মন romantic-

touch ছাড়তে পারে না কি না! তাই নিয়ে আমাদের কাল খুব তর্ক হয়ে গেছে...

অবনী সকৌতূহলে গিরীনের পানে চাহিল। গিরীন কহিল—একটু ধৈর্য্য ধরো...তাকে এনে এ তর্কের যবনিকা-পাত করি।...

গিরীন উঠিতেছিল, সহসা ফিরিয়া কহিল—চা খেয়ে এসেচো?

—নিশ্চয়।

—আর এক পেয়ালা হবে?

—না।

—বেশ, আমি আসচি।...

গিরীন উৎসাহ-ভরে সে ঘর ত্যাগ করিল।...অবনীর মনে আবার চিন্তার মালা গাঁথা চলিল। কিসের তর্ক?...

নির্ম্মলার মনে romanceএর touch! তার অর্থ?...অর্থ পরক্ষণে রঙীন হইয়া দেখা দিল।...লজ্জায় অবনী কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। আনাড়ি লেখকের সেই কল্পনা!...ছি।

গিরীন ফিরিয়া আপনার মনে কহিল,—মেয়েদের obstinacy! যা সত্য, তা মানবে না! ও বি-এ পাশই বলো, এম-এ পাশই বলো, সব ভস্মে ঘী ঢালা! কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ।

অবনী নিরুত্তরে তার পানে চাহিয়া রহিল। গিরীন কহিল—যেজন্য গিয়েছিলুম—হ্যাঁ...

বাধা দিয়া অবনী কহিল,—ভালো কথা, নির্ম্মলা কেমন এগ্‌জামিন দিলেন?

—তাঁকেই সে প্রশ্ন করো। তিনি এখনি আসবেন। স্নান করতে গেছেন।...হ্যাঁ, যা বলছিলুম...কাল বায়োস্কোপে যাবার আগে আমাদের স্থির হয়েচে, আজ অপরাহ্ন চার ঘটিকায় এখান থেকে যাত্রা করে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছুবো। সেখানে বৈকালিক জলযোগ, বায়ু-সেবন, গান, গল্প প্রভৃতি হবে। নৌকাযোগে বিচরণ সেরে তারপর প্রত্যাবর্ত্তন। তোমারও নাম উঠেচে ...সাথী হওয়া চাই।

—কে কে যাচ্ছেন ?

গিরীন কহিল,—শ্রীধর, অজিত, নির্ম্মলা আর আমি। নতুন ছুটি অতিথিরও যোগ দেবার কথা আছে। এক, হিমাংশু—নব্য ব্যারিষ্টার বন্ধু। তাঁর জন্যই চারটের আগে বেরুনো সম্ভব হবে না। তিনি সোজা সেখানে যাবেন—বেলা সাড়ে পাঁচটায়। পাছে আমরা ভাবি, পশার নেই!...চাল আর কি!

অবনী মৃদু হাসিল। গিরীন কহিল—দ্বিতীয়, আমার গৃহিণী। ...যাচ্ছো তো ? চলো, inspiration পাবে। তোমাদের এ সব সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। অবশ্য একলা যেতে পারো... কিন্তু দলে মিশে গেলে কল্পনার প্রসার বাড়ে।

অবনী খবরের কাগজখানা টানিয়া লইল—কোনোমতে সময়টুকু কাটাইবার উদ্দেশ্যে। নির্ম্মলা দেবী না আসিলে আলাপ-আলোচনায় মন লাগিতেছে না। কাল ছবি দেখা হইয়াছে—ঐ ছবি লইয়াই...

গিরীন কহিল,—মেয়েটি লেখাপড়া বেশ জানে ?

অবনী কহিল—মন্দ নয়। ভাবচি, কুন্দকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবো...

গিরীন চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর কহিল—নাম কুন্দ? না, তোমাদের বাড়ী এসে এ-নাম-পরিগ্রহ হলো?

অবনী কহিল,—না, কুন্দই নাম। এর উপর আমাদের কোনো কারচুপি নেই।

গিরীন হাসিল, হাসিয়া কহিল—নামটা ভারী alluring হে... কুন্দকলি! সেই ফোটে, ফোটে, ফোটে না! বেচারী কুন্দ! সাবধান নগেন্দ্রনাথ...এই অবধি বলিয়া গিরীন থামিল, পরক্ষণে কহিল—তবে তোমার গৃহে সূর্য্যমুখী নেই—তাই রক্ষা।...

কথাটা অবনীর খুব ভালো লাগিল না। সে কোন উত্তর দিল না। গিরীন কহিল,—ভয় নেই, তাই বা কি করে বলি? কুন্দও নগেন্দ্রনাথের গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল,—অনূঢ়া তরুণী। তার পাত্র জুটলো হতভাগা তারাচরণ। ভাগ্য বিরূপ—মারা গেল। তারপর নগেন্দ্রনাথের গৃহে বেচারী কুন্দর দুর্ভাগ্য!... সুরু হলো তাই ভয় হয় হে, তামরা ধরে বেঁধে যেন একটি তারাচরণ এনে তার হাতে এ কুন্দকে সঁপে দিয়ো না। তারাচরণ মারা যেতে যেতে তোমার গৃহে সূর্য্যমুখী এসে আসন পেতে বসবেন! এবং...

বাধা দিয়া অবনী কহিল,—থামো গিরীন। কি যে বলো! অনূঢ়া তরুণী...you should respect her.

গিরীন কহিল,—Respectএর অভাব কোথায় দেখলে? তুমি

ঔপন্যাসিক। হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চা করো—কল্পিত নর-নারীর সুখে-দুঃখে বিগলিত হও...জীবন্ত নর-নারীর হৃদয়-সম্বন্ধেও তেমনি সচেতন থেকো। কারণ, তোমার কুন্দর যে কাহিনী শুনলুম, তাতে বেশ বুঝচি, স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শ এ কুন্দ পায়নি। তোমাদের এখানে স্নেহের সমুদ্র দেখচে...

হাসিয়া অবনী কহিল,—দুদিন বিবাহ করে নারীর হৃদয় একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলেচো, দেখচি।

—কণ্ঠস্থ কথাটা ভুল! ও-বস্তু কি বিষ যে, শিবের মত কণ্ঠস্থ করবো? বরং বলো, আয়ত্ত করেচি।...তা বললে কথাটা সত্য হবে। অতিরঞ্জিত সত্যও নয়।

অবনী কহিল,—তামাসা নয়। মা তাগিদ দিচ্ছে, কুন্দর জন্য একটি ভালো পাত্র দেখে দিতে। তুমি কোনো পাত্র suggest করতে পারো?

তিল বিলম্ব না করিয়া গিরীন কহিল—পারি।

—তোমার জানা?

—খুব।

—কে? অবনীর স্বরে বিস্ময় ও কৌতূহল।

গম্ভীর কণ্ঠে গিরীন কহিল—আমার সামনেই তিনি বিরাজ করচেন। শ্রীযুক্ত অবনীলাল...

খপরের কাগজখানা সবলে গিরীনের গায়ে নিক্ষেপ করিয়া অবনী কহিল—You are a rascal!

গিরীন কহিল—এই জন্যই শাস্ত্রকার বলেচেন, সত্যং ব্রুয়াৎ

প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। এ কথাটা অবশ্য প্রিয়ই। তবে অপ্রিয় দাঁড়াচ্ছে এই কারণে যে তোমার মনের গোপন বার্ত্তার সন্ধান এতে ব্যক্ত হচ্ছে। গোপন-কথার প্রচার প্রথমে অপ্রিয় মনে হয়, কিন্তু পরিণামে পরম-রমণীয়ং।

অবনী কহিল,—না, না...সত্য বলচি, এমন চিন্তা আমার মনের গোপন-কোণে কখনো উদয় হয়নি। বেচারী কুন্দ—বড় ভালো মেয়ে—বেশ, তাকেও আজ দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবো। আলাপ করে দেখো, তার কোনো কুণ্ঠা, কোনো সঙ্কোচ নেই। এমন সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী...ছোট বোনটির মত পাশে এসে দাঁড়িয়েচে। গরীব হলেও তার মনের তেজ আছে।

গিরীন কহিল,—মন্দ কি! নিমুরা যাচ্ছে, কুন্দকেও সঙ্গে নাও...তিনজনে আলাপ করতে পারবে। নাহলে সত্যি, নিমুটা আমাদের সঙ্গে মিশে, আমাদের সঙ্গে তর্ক করে-করে feminine softnessটুকু ঘুচিয়ে ফেলচে! Masculine mindএর মেয়ে আমার দু'চক্ষের বিষ। তারা দুকুল-হারা। কোনো দলে বরণীয় নয়, কাম্য নয়।...আমি নিমুকে বলে আসি। ঐ যে অজিতচন্দ্রর শুভাগমন হচ্ছে। তোমায় একা থাকতে হবে না।...

কথার সঙ্গে সঙ্গে অজিত আসিয়া দেখা দিল, এবং গিরীনের অন্তর্ধান। অজিত আসিয়া কহিল—এই যে অবনীবাবু! সেই আলাপ হলো—তারপর এ-দিক মাড়ান না!...ব্যাপার কি? বিবাহের আয়োজন করচেন না কি?

অবনীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! সকলের মুখে এক সুর! এ শুধু কাল ঐ কুন্দকে লইয়া বায়োস্কোপে যাওয়ার ফল! কিন্তু এ কি ভুল ধারণার উপদ্রব!...

অবনী কহিল,—না। বিবাহেব কল্পনাই নেই, তার আয়োজন কি রকম?

অজিত কহিল—গিরীন বলছিল, কাল আপনার lady-love-কে নিয়ে বায়োস্কোপে গেছলেন...

অবনী কহিল—সম্পর্কে তিনি আমার এক-রকম ভগ্নী...

—I see. ক্ষমা করবেন। ঐ গিবীন গর্দ্দভটা বলছিল। শুনে আমার হিংসা হচ্ছিল—কারণ, বিবাহের পূর্ব্বে পত্নীর সঙ্গে আলাপের মোটে সুবিধা পাইনি। তারপর এক সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখার আনন্দ—আজ পর্য্যন্ত ভাগ্যে ঘটেনি! পত্নী আমার অবাধ্য নন্—এবং আদর্শরূপিনী বলে সমাজে তাঁর গর্ব্বও করি, তবু লজ্জাবতী লতা! লোক-লোচন-স্পর্শে ব্রীডা-ভরে সঙ্কুচিতা হন্!

গিরীন ফিরিল, তার হাতে একখানা ফর্দ্দ। ফিরিয়া কহিল—নাও—দক্ষিণেশ্বরের আনন্দ ভোগ করো! নিমু আর গৃহিণী বসে এই ফর্দ্দ বানালেন...কেক্, বিস্কুট, স্যাণ্ড-উইচ্ প্রভৃতি রশদ যাবে, এবং ফাউল-কারি প্রভৃতি। এখন চলো মার্কেটে...রামপক্ষী ব্রাউন-ব্রেড্ প্রভৃতি সংগ্রহ করতে।

অজিত কহিল—ডাকো নিমুকে...আহারে এ বৈদেশিক রুচির আমি সমর্থন করি না।

গিরীন কহিল—তা না করলেও ভোজ্যটুকু রসনার পক্ষে পরম তৃপ্তিকর।...অবু মার্কেটে যাবে ?

—চলো...

গিরীন কহিল—পাঁচ মিনিট সময় দাও for changing the spool ! মানে, changing robes...এঁদের জিনিষ-পত্র এনে দিলে দায়ে খালাশ হবো। ঘরে এ-সব ভোজ্য এঁরা তৈরী করবেন।

অবনী কহিল—এঁদের কষ্ট দেবে ?

গিরীন কহিল—কষ্ট বিনা কেষ্ট-লাভ না হয় সংসারে ! ...এ কষ্টটুকু ওঁদের করতে দাও—কখনো এ ভোজ্য-রচনা থেকে নিরস্ত রেখো না—সংসার মরুভূমি হয়ে উঠবে !

অজিত কহিল—ঠিক ! We all married people agree...

পাঁচ মিনিটে গিরীন তৈয়ার হইয়া আসিল। অজিত এবং অবনীও উঠিল। তারা বাহির হইবে, নির্ম্মলা আসিয়া ডাকিল, —দাদা...

গিরীন কহিল—পেছু ডাকলি ! মোরগের বংশ হয়তো দুর্বৃত্ত রসনা-লোলুপদের জ্বালায় মার্কেট-শূন্য হয়ে যাবে !

অবনী ফিরিয়া চাহিয়া নির্ম্মলাকে নমস্কার করিল, কহিল— ভালো আছেন ?

চকিতের জন্য তার পানে চাহিয়া নির্ম্মলা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল ; এবং অবনীর কথার উত্তর না দিয়া গিরীনকে কহিল,— বৌদি বললে, বেকিং পাউডার আর এক-শিশি জ্যাম ঐ সঙ্গে

এনো, দাদা। এসেন্স অফ্ ভ্যানিলা একটু ভালো দেখেই এনো—পুডিঙে না হলে খোশ্‌বু হবে না!

—তাই হবে। ফর্দ্দয় ভ্যানিলা-এসেন্স লেখা আছে তো?

—আছে।...বেকিং-পাউডার আর ঐ জ্যাম ফর্দ্দয় লিখে নাও। নাহলে শেষে তর্ক করবে, বলবে, ফর্দ্দয় নেই, লিখে দিস্‌নে —জানি তো তোমায়!

—আচ্ছা, আচ্ছা বাপু, লিখে নিচ্ছি! ফর্দ্দ বাহির করিয়া গিরীন লিখিয়া লইল, পরে কহিল—নিশ্চিন্ত থাকো! ভুলে যদি নিজে দোকানে থেকে যাই, তোমাদের জিনিষ আসবে, আসবে...

বিদায়-কালে নির্ম্মলার পানে অবনী আবার চাহিল। নির্ম্মলার দৃষ্টি কেমন উদাস! অবনী যেন তার অচেনা—তার পানে নির্ম্মলা চাহিয়াও দেখিল না! কেন এমন দৃষ্টি! অবনীর মাথার উপর সারা আকাশ ম্লান হইয়া আসিল।...

মার্কেট হইতে ফিরিতে বেলা এগারোটা বাজিল। গিরীন কহিল,—বসবে না?

অবনীর মনে পড়িল, শিবপুরে যাওয়ার কথা। সে কহিল,—না। বেলা হয়েচে, বাড়ী যাই।...

বাড়ী গিয়া সে দেখে, দোতলার সিঁড়ির উপরে কুন্দ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অবনীকে দেখিয়া কুন্দ কহিল—বাড়ী ফেরবার কথা মনে হয়েচে? তবু ভালো!

ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে অবনী কহিল—হ্যাঁ, মানে, একটু বিপদে পড়েছিলুম, কুন্দ।

কুন্দ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—আবার কার থার্ড ক্লাশ গাড়ী ভাঙলো না কি পথে ?

মৃদু হাসিয়া অবনী কহিল—তেমন ভাগ্যবতী কুন্দমালা ছাড়া আর কে হতে পারে ?

কুন্দ কহিল—থাক্, কথার মালা আপনি খুব ভালো রচনা করতে পারেন, জানি। ওতে কিন্তু মা ভুলবেন না। মা খুব রাগ করেচেন, বললেন,—একটা সখ হয়েছিল...

অবনী কহিল—মার সখই বুঝি বেশী—শিবপুর যেতে... ?

কুন্দ কহিল—তা কেন ? আমিই মাকে বলে তাঁকে কত করে রাজী করিয়েছিলুম। তাতে তাঁর ইচ্ছাও হয়েছিল। আপনার দেরী দেখে তাঁর মন বিগড়ে গেছে,—বলেন, থাক্, অতদূর যাওয়া...দুদণ্ড যদি না রইলুম তো মিথ্যে যাওয়া।...তা হলেও আপনি চট্ করে নিন...

অবনী একটু চিন্তিত হইল—এতখানি আগ্রহের মুখে... হঠাৎ শিবপুর যাওয়া বন্ধ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা...! সে কোনো কথা না তুলিয়া ঘরে গিয়া জামা-জুতা ছাড়িয়া স্নানের উদ্যোগে চলিল।

স্নানের পর আহার। মা কহিলেন—এত বেলা করে ফিরলি ! কখন আর যাবো ?

অবনী বর্ত্তাইয়া গেল। এই সুযোগে সে কহিল—বেশ, তাহলে আজ না হয় থাক্। কাল চলো।

কুন্দ ফোঁশ্ করিয়া উঠিল, কহিল,—বটে! সব ঠিক-ঠাক... এখন যাওয়া বন্ধ হতে পারে না।

অবনী কহিল—কেন? কাল তো যাচ্ছি। সত্যি, আজ এত বেলা হয়ে গেছে...

—ইচ্ছা করে বেলা করলেন কেন? আপনারি দোষ...

অবনী কহিল—তার চেয়ে এক কাজ করি,—চলো, তোমায় দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাই।

—আমি যেতে চাই না।...বলিয়া কুন্দ মুখখানা ঘোরালো করিয়া বসিয়া রহিল।

অবনী প্রমাদ গণিল। এই মেজাজের সামনে গিরীনের প্রস্তাব তোলা চলে না। অনর্থ তাহাতে বাড়িবে বৈ কমিবে না। নিঃশব্দে আহারাদি সারিয়া অবনী গিয়া ঘরে বসিল।... সারদা দেবীর হাত ধরিয়া টানিয়া কুন্দ তাঁকে ভোজনে বসাইল, কহিল—নিন মা। একটু দেরীতে বিশেষ এসে যাবে না। আজ যাওয়া বন্ধ রাখলে আর কখনো হয়তো হবেও না!

মাকে আহারে বসিতে হইল। কুন্দও দ্রুত খাওয়া সারিয়া আসিয়া অবনীকে তাড়া দিল; কহিল—মা রাজী হয়েছেন। আপনি তৈরী হয়ে নিন্। আমি তৈরী হতে চললুম...এক মিনিট দেরী করলে কিন্তু কুরুক্ষেত্র বাধাবো।...

কথাটা বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশা মাত্র না করিয়া বিদ্যুতের গতিতে কুন্দ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অবনী যেন অচেতন-প্রায়। চেতনা ফিরিতে সে ডাকিল—কুন্দ...

পাশের ঘর হইতে কুন্দ কহিল—কেন ?

অবনী কহিল—শুনে যাও। ভারী দরকারী কথা আছে।

কুন্দ আসিল। অবনী কহিল—আমি বলি, সত্যি, আজ বেলা হয়ে গেছে, আজ না হয় শিবপুর থাক—কাল বেলা এগারোটায় বেরুনো যাবে।

কুন্দ প্রবল ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না। কাল একাদশী। মার কষ্ট হবে।

অবনী কহিল—শোনো, আজ বরং দক্ষিণেশ্বরে চলো—তুমি আর আমি...

কুন্দ কহিল—না। মার সঙ্গে তামাসা করতে পারবো না আমি।...এ কি খেয়াল আপনার! দেরী না হয় একটু হলোই...

অবনী কহিল—পাগলামি করো না। শোনো,—কাল রাত্রে আমার সেই বন্ধু গিরীন এসেছিল—মার কাছে শুনেচো তো ?

কুন্দ কোন কথা না বলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অবনীর পানে চাহিয়া রহিল। অবনী কহিল—তারা ঠিক করেচে, আজ বেলা চারটেয় সকলে দক্ষিণেশ্বরে যাবে...আমাদেরও নিমন্ত্রণ করেচে, মানে, আমাকে, তোমাকেও। তা আমি কথা দিয়ে এসেচি। না গেলে ভারী খারাপ দেখাবে। তোমায় পাকা কথা দিচ্ছি, কাল আমরা শিবপুরে যাবোই—এ কথার নড়চড় হবে না। হলে আমার সঙ্গে আড়ি করে দিয়ো।

কুন্দ কহিল—ও!...কিন্তু আমরা যে সঙ্কল্প করেচি, কেন তার নড়চড় করবো? আপনার বন্ধুর কথাই শিরোধার্য্য করতে হবে! মার কথা ভেসে যাবে?

অবনী কহিল—তুমি মার কথা অত বড় করে ধরচো কেন? তাঁকে বুঝিয়ে আমি যদি রাজী করাতে পারি...

চপল ভঙ্গীতে কুন্দ গিয়া খড়খড়ির ধারে বসিয়া পড়িল, কহিল—আপনার যা খুশী করুন। আমায় কেন ও কথা বলচেন!...বেশ, মাকে রাজী করাতে পারেন, দেখুন...

অবনী কহিল—এই তো লক্ষ্মীর মত কথা! তাহলে মাকে রাজী করালেই তো চলবে? দক্ষিণেশ্বরে গিরীনের স্ত্রী যাচ্ছে, সেই নির্ম্মলা যাচ্ছেন...

কুন্দ কহিল—যাঁর খুশী তিনি যান্—আমি মোদ্দা যাবো না...

—যাবে না?

—না। আমার এক কথা! আমি কোথাও যাবো না... কোনো দিন আমায় আর কোথাও যেতে বলবেন না—বলিতে বলিতে তার স্বর বাষ্পার্দ্র, দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে আঁচলে মুখ গুঁজিল।

প্রমাদ গণিয়া অবনী নিস্পন্দ বসিয়া রহিল। আশা-ভঙ্গে কুন্দর অভিমান বিচিত্র নয়—অবনী তা বুঝিল।...কিন্তু এও যে দুর্জ্জয় পণ! আজ না হয়, কাল তো যাওয়া হইবে। আজ একজনরা নিমন্ত্রণ করিয়াছে...

অবনী কহিল,—তুমি মিছিমিছি রাগ করচো, কুন্দ! ধরো,

যদি আমার কি তোমার হঠাৎ অসুখ হতো ? তাহলেও তো যাওয়া বন্ধ হতো...

কুন্দ বাষ্প-গদগদ স্বরে কহিল—অসুখ তো হয়নি।...আজ বলচেন, কাল যাবেন—কাল যদি কারো অসুখ হয় ?

অবনী হাসিয়া কহিল—তাহলে কালও যাওয়া বন্ধ হবে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কুন্দ কহিল,—কারো অসুখে দরকার নেই। আমি কোথাও যেতে চাই না...বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গম্ভীর পাদক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।...

অবনী ক্ষণেক বসিয়া মার কাছে গেল। আহারান্তে মা বিশ্রাম করিতেছিলেন, কহিলেন,—এই যে, তোদের হলো ? আমি এক মিনিটে তৈরী হবো—শুধু কাপড়খানা বদলানো বৈ তো না...

অবনী কহিল—আজ যাওয়া থাক মা—কাল আমরা যাবো। একটু কারণ আছে...

অবনী কারণ খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মা কহিলেন,—বেশ, তা তোরা দক্ষিণেশ্বরেই যা। আমায় নয় আর একদিন নিয়ে যাস্ বাপু, ঐ দক্ষিণেশ্বরে। আজ তোদের চড়িভাতির দলে যাবো না। আমি সকালে যেতে চাই, গিয়ে গঙ্গা-স্নান করবো, তার পর ঠাকুর দেখে বাড়ী ফিরবো।

এদিককার গোল চুকিল। এখন কুন্দ ?...অবনী আসিয়া তার ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। খোলা খড়খড়ির ধারে কুন্দ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অবনী কহিল—রাগ ভাঙ্গলো ?...

কুন্দ কোনো জবাব দিল না—নড়িলও না। অবনী কহিল—মাথা ঠাণ্ডা করে একটু বুঝে গ্যাখো, কুন্দ। আমার অপরাধ মার্জ্জনাযোগ্য মনে হবেই!...এখন বিরক্ত করবো না। একটু বরং সেই উপন্যাস লেখার চেষ্টা করিগে। অবনী আর একবার কুন্দর পানে চাহিয়া চলিয়া গেল। উপন্যাসের কথাটা তুলিল শুধু কুন্দকে লোভ দেখানোর অভিপ্রায়ে—যদি সে কথায় কুন্দর মন না-যাওয়ার বেদনা ভুলিয়া উপন্যাসের প্রতি লোলুপ হয়!...

অবনী আসিয়া নিজের ঘরে উপন্যাসের খাতা খুলিয়া বসিল। লেখা হইল না। লেখায় মন নাই। খাতা খুলিয়া দ্বারে কাণ পাতিয়া রহিল—কুন্দ কখন আসে!...কিন্তু কুন্দ আসিল না। অবনীর কেমন আলস্য বোধ হইতেছিল। সে বিছানায় শুইয়া পড়িল—শুইয়া চক্ষু মুদিল। তারপর নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে...

ঠ্যালা পাইতে ঘুম ভাঙ্গিয়া অবনী চাহিয়া দেখে, কুন্দ। সে উঠিয়া বসিল। কুন্দ কহিল—সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। চারটেয় আপনাদের যাবার কথা না?...

—ও!...ঠিক বলেচো! ঘুমিয়ে পড়েছিলুম,—তাই তো!

কুন্দ কহিল—উঠুন তাহলে।

অবনী কহিল—তুমি চট্ করে তৈরী হয়ে নাও। আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি।...

মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া অবনী তৈরী হইল। কুন্দ চায়ের পেয়ালা আনিয়া টেবিলে রাখিল। অবনী কহিল,—এ কি, তুমি তৈরী হওনি এখনো! চারটে বাজতে সতেরো মিনিট বাকী...

কুন্দ কহিল—আমি যাবো না।

—যাবে না ?

—না।

—সে কি, কুন্দ !

—আমার খুশী। আমার যেতে ভালো লাগচে না। ভালো লাগা না লাগার উপর মানুষের হাত নেই।

অবনী অপলক নেত্রে কুন্দর পানে চাহিয়া রহিল। কুন্দ কহিল,—চা খেয়ে নিন্, জুড়িয়ে যাচ্ছে।...তাছাড়া আমার কি সব সাধ সাজে ?

অবনী কথাটা ঠিক শুনিল না ; কুন্দর হাত ধরিয়া কহিল—সত্যি যাবে না ?

—না।

—আমি এত করে বলচি...অবনীর স্বর মিনতিতে ভরা।

কুন্দ কহিল—আর বলবেন না। যাবার ইচ্ছা নেই—না হলে আপনাকে এত বলতে হতো না !

কথাটা বলিয়া হাত ছাড়াইয়া কুন্দ খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইল।

অবনী নিঃশব্দে চা পান করিল। পানান্তে আবার কহিল—যাবে না তাহলে ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কুন্দ কহিল—না। বলিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অবনী মুহূর্ত্ত থামিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল।...

গিরীনের গৃহে কলরবের সীমা নাই। সকলে তৈরী—মোটর দাঁড়াইয়া আছে। অবনী কহিল—ব্যাপার কি ?

গিরীন কহিল—নিমুর খেয়াল, সে যাবে না। তার মাথা ধরেচে...

বাঃ! অবনী নির্ব্বাক। গিরীন কহিল—না যায়, আমরা তৈরী—যাবো। আমার গৃহিণীও বেঁকে দাঁড়িয়েচেন...নিমু না গেলে তিনিও যাবেন না। এই মেয়ে-জাতটা এক অসম্ভব বস্তু! ওদের equality দেবে ? ছাই দেবে। একটু unity নেই—sacrifice নেই—যেমন গোঁ, তেমনি ঝাঁজ! চক্ষু-লজ্জা জিনিষটাও কি ভগবান ওদের দেননি!

অবনী কুণ্ঠিত স্বরে কহিল—তবে না হয় থাক্...

গিরীন কহিল—কভি নেহি।...আমরা যাবোই।...এবং আজ প্রতিজ্ঞা করচি, আর equality নয়, fraternity নয়—একদম dislocation.

গিরীনের আলোচনায় কাহারও প্রতিবাদ টিঁকিল না। সকলকে মোটরে চড়িতে হইল।...কিন্তু আনন্দ রহিল না। অবনীর নিরানন্দ আরো বেশী...সারা পথ সে শুধু ভাবিতেছিল, সত্যই নারীর হৃদয়কে কি উপাদানে গড়িয়াছ ভগবান! মমতাও নাই ? কুন্দকে অত সাধিয়াও সে আনিতে পারিল না—এখানে নির্ম্মলাও হঠাৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে!

গিরীন কহিল—তোমার কুন্দমালা কৈ হে ? তিনিও এলেন না! তাঁরো কি মাথা ধরা ?

অবনী চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। একটু চিন্তা করিয়া সে মিথ্যা কথাই কহিল, বলিল,—মাথা ধরা নয়। বাড়ীতে ওদের অন্য কাজ আছে। মাকে ছেড়ে আসা তার পক্ষে এখন সম্ভব হলো না।

এই হিংস্র আলোচনার মধ্যে কুন্দকে নামাইতে অবনীর কেমন বাধিল।...বেচারী! তার না আসার মধ্যে সেই আশা-ভঙ্গের বেদনা! সে বেদনা, সেই সঙ্গে কুন্দর সজল চোখের দৃষ্টি অবনীর প্রাণে দরদ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সে তাকে কঠিন বিচারের জন্য এক্ষেত্রে দাঁড় পারিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রথম চিন্তা

দক্ষিণেশ্বরে আমোদ তেমন জমিল না—জমিবে না, সকলেই বুঝিয়াছিল। গিরীনরা সদলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিল। ফিরিয়া শুনিল, দোতলার ঘরে গান চলিয়াছে। নির্ম্মলা গাহিতেছে।

গিরীন কহিল—মাথা ধরা কেমন, দেখচো তো!...এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে!

অজিত কহিল—নারী চির-রহস্যময়ী।

গিরীন কহিল—আমি বাজে সেন্টিমেণ্ট পছন্দ করি না। One should be practical. আমরা সত্যই পরীর-রাজ্যে বাস করি না।

অবনী গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল, গিরীন কহিল—এর মধ্যে?...সন্দেহ হয়, বন্ধু...

শ্রীধর কহিল—কিসের সন্দেহ?

গিরীন কহিল,—Young maid and gay bachalor—শাইকলজি বলে...

বাধা দিয়া অবনী কহিল—তোমার রুচি যা হচ্ছে, তাতে তোমার উচিত, অবিলম্বে ঐ লক্ষ্মীছাড়া ইতর উপন্যাস লেখা! She is a lady and no fuss about her.

গিরীন কহিল—ক্ষন্তব্যোঽয়মপরাধঃ। মোদ্দা, আমি নিমুকে একবার দেখতে চাই। দক্ষিণেশ্বরের আইডিয়া তারই—অথচ...

অবনী কহিল—মাথা থাকলেই মাথা ধরে, ভাই। তাছাড়া মাথা ধরাটা খুব সহজ ব্যাপার এবং বিনা-নোটিশেই দেখা দেয়।

গিরীন কহিল—Still I smell some mystery! তোমরা বসো...তাকে নীচে এসে গাইতে হবে। আমাদের প্রতি যে অন্যায় করেচে, তাতে তার কিছু প্রতিকার হবে!

গিরীন কি রকম একরোখা, কাহারো তা অবিদিত নয়।... তাকে বাধা দিয়া লাভ নাই! কেহ বাধা দিল না।

গিরীন চলিয়া গেলে অজিত কহিল—আপনার বাড়ীর কথা শুনলুম। মেয়েটির যা কাহিনী, তা সত্যই অদ্ভুত! তাঁর সাহসের তারিফ করি। চরম নির্য্যাতন বহন করার পূর্ব্বে এমন মরিয়া হয়ে আত্ম-রক্ষার প্রয়াস! এঁকে প্রকাশ্য সভায় দাঁড় করিয়ে জয়মাল্যে আমাদের অভিনন্দিত করা উচিত। একেই বলে নারীর জাগরণ! নাহলে শুধু মিটিং ডেকে সভায় বক্তৃতা, আর কাজের বেলায় জুজু and ঢু-ঢু—রামোঃ!

শ্রীধর কহিল—কিন্তু এর একটা বদ effect আছে।... ছোট-খাট ব্যাপারেও বাজে সেণ্টিমেণ্টে নির্ভর করে যদি এমন flight চলতে থাকে...

অজিত কহিল—বাজে সেণ্টিমেণ্টে মানুষ আত্মহত্যাও করে। তাতে অনুকম্পা হয়, দরদ জাগে কৈ? বেদনা কেন পাবো? মনকে খুব বেশী ঠুনকো করা হলো ব্যাধির লক্ষণ। সে ঠুনকো মন নিয়ে কঠিন পৃথিবীতে বাস করা চলে না! সংসারের পথে চলতে হলে মনকে fit করা চাই—আর এ fitness থাকলে মানুষ সহস্র বিপদে বাঁচবেই। অবনী বাবুর বাড়ীতে এ মেয়েটি আশ্রয় পেয়েচেন, সংসারের পীড়নের বিরুদ্ধে লড়বার এঁর শক্তি আছে—ইনি বাঁচবেন। কোনো বিপদ এঁকে কোনো দিন কাতর করতে পারবে না। বাজে সেণ্টিমেণ্ট বাড়লে তা hysterics-এ দাঁড়ায়। Hysterics দস্তুরমত ব্যাধি—তার চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

এমনি আলোচনার মধ্যে গিরীন ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—আসচে। গান গাইতে রাজী হয়েচে।

অজিত কহিল—অবনী বাবুর বাড়ীর সেই মেয়েটিকে অভিনন্দন দেওয়া উচিত। তুমি কি বলো? . তাঁর এই সাহস...

গিরীন কহিল—আমার স্ত্রীও ভারী তারিফ করছিলেন... আলাপ করবার জন্য তাঁর আগ্রহ অপরিসীম। তা, তিনিও তো আসতে পারলেন না আজ! বেশ, মহম্মদ যদি পর্ব্বতের কাছে না যান, পর্ব্বতই তাঁর কাছে যাবে।...আমরা একদিন সদলে অবনীর ওখানে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে আসি, চলো...

অজিত কহিল—I agree. অবনী বাবু, দিন-স্থির করুন।

শ্রীধর কহিল—এই যে নিমু...Hail to thee, blithe spirit—এসো...

নির্ম্মলা আসিল। অবনী চাহিয়া দেখিল—এ যেন সে হাস্যময়ী নির্ম্মলা নয়! তার ছায়া! মুখ মলিন!

গিরীন কহিল,—সন্ধি হয়ে গেছে। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী তুমি একটি গান শুনিয়ে দেবে।

নির্ম্মলা কুণ্ঠিতভাবে একখানা চৌকিতে বসিল। শ্রীধর কহিল—হার্ম্মোনিয়মটা যে দূরে রইলো...

নির্ম্মলা কহিল—শরীর ভালো নেই! গান সুবিধার হবে না।

গিরীন কহিল—বাঃ, এইমাত্র রাজী হলে...আর নীচে নামতে না নামতেই শরীর খারাপ!

অজিত কহিল—তুমি বর্ব্বর, তা যাই বলো গিরীন!

গিরীন একদৃষ্টে নির্ম্মলার পানে চাহিয়া ছিল, কোনো জবাব দিল না। অবনীও চাহিল...দেখে, নির্ম্মলা মুখ নত করিয়া বসিয়া আছে।

অজিত কহিল—আদপে গাইতে পারবে না?

নির্ম্মলা নত মস্তকে কহিল—গলাও কেমন ধরে আছে!

গিরীন কহিল—কি যে বলো তুমি!...বেশ, গাইতে হবে না।...শ্রীধর তুমি ধরো।

অবনীর ভালো লাগিতেছিল না। সে কহিল—আজ উঠি। আমায় মাপ করবেন সকলে, বিশেষ কাজ আছে বলেই...

অজিত কহিল—তাহলে দিন স্থির করুন। তামাসা নয়—সত্যি, she deserves recognition.

অবনী কহিল—বেশ, ব্যবস্থা করবো।...

অবনী চলিয়া গেল। গিরীন নির্ম্মলাকে কহিল—তুমি বসে রইলে কেন? শরীর খারাপ হয়ে থাকে যদি তো উপরে গিয়ে গাও—তাতে শরীর সারবে।

নির্ম্মলা কহিল—আমি বুঝি তাই বলেচি? তার স্বরে অনুযোগ।

গিরীন কহিল—মুখে না বলো, তোমার আচরণে এই অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে।...শরীর খারাপ বোধ হচ্ছিল যদি তো উপরে সে কথা বললে না কেন?

ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ম্মলা কহিল—আমি তর্ক করতে পারবো না তোমার সঙ্গে। আমার গাইতে ভালো লাগচে না...

গিরীন কহিল—উপরের ঘরে তো বেশ গাইছিলে!

নির্ম্মলা কহিল—খুশী হয়েছিল, তাই। এখন যদি আমি না গাই?

—বেশ, জোর নেই। তুমি তাহলে আসতে পারো...

নির্ম্মলা এ কথায় এক নিমেষও বসিল না, উঠিয়া চকিতে চলিয়া গেল। গিরীন তার পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টির অন্তরালে গেলে গিরীন কহিল—রীতিমত mystery! এ ভাব ওর কখনো দেখিনি। আজ মার্কেট থেকে ফিরে আসা অবধি দেখচি, ক্ষণে-ক্ষণে বৈলক্ষণ্য! গম্ভীর ভাব! এর মানে কি?

অজিত কহিল—শরীর ভালো নয়, মনও খারাপ—হয়তো বিশেষ কোনো কারণে। মানে আবার কি থাকতে পারে ?

গিরীন কি ভাবিতেছিল, কহিল,—এগ্‌জামিন নয়, হঠাৎ এমন ভাবান্তর কেন হবে ? She has always been a very good girl, always gay and sweet.

শ্রীধর কহিল—আমরা তাহলে উঠি হে। দক্ষিণেশ্বরে একটু ছুটোছুটি করা গেছে—শ্রান্তি বোধ করচি।

গিরীন সে কথায় কোনো প্রতিবাদ না তুলিয়া আত্মগত ভাবেই কহিল,—দিনটার উদয় হয়েছিল চমৎকার! তারপর এক দম্‌ খিচ্‌ড়ে গেল! ধুত্তোর নিকুচি করেচে! ঘরে বসে থাকা আর নয়।...একটা কারবার খোলা যাক, অজিত!

হাসিয়া শ্রীধর কহিল—ফিল্ম-তোলার ?

গিরীন কহিল—না, না। I mean it serious! তোমার কি! টুক্‌টুক্‌ করে ল'য়ের দুটো এগজামিন পাশ করে ফেললে,—তৃতীয়টা হলেই কেল্লা ফতে! আমরা ঘরে বসে delightful vagabonds হয়ে উঠচি। বুদ্ধিবৃত্তিতে মরচে ধরে যাচ্ছে। তবে ওকালতিতে নৈব নৈব চ!

অজিত কহিল—যা বলেচো! আমারো থেকে থেকে মনে হয়, এ ভাবে অর্থ আর সময়ের অপব্যবহার উচিত নয়। আমরা নেহাৎ অজবুকও নই...বেশ, তুমি চিন্তা করো—আমিও চিন্তা করবো!...এখন তাহলে উঠি ভাই।... ...

অবনী সোজা বাড়ী আসিল। বাড়ী আসিয়া দোতলার ঘরে

ঢুকিয়া দেখে, কুন্দ সেখানে নাই। ভৃত্যকে ডাকিল, ভৃত্য আসিল। ভৃত্য আসিলে অবনী কহিল—একটু চা তৈরী কর্। আমি স্নান করতে যাচ্ছি।...

ভৃত্য আদেশ-পালনে গেলে অবনী গায়ের জামা খুলিয়া ক্ষণেক বসিল। কুন্দর তবু দেখা নাই! অবনী কুন্দকেই চাহিতেছিল—যেখানেই থাকুক, গৃহে ফিরিলে কুন্দ তখনি আসিয়া দেখা দেয়। কুন্দর সঙ্গে এই সাক্ষাৎটুকু এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—সেই অভ্যাসের বশেই মন চাহিতেছিল, কুন্দ কৈ?

কুন্দ আসিল না। অবনীর কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইল। উঠিয়া উচ্চ রবে ভৃত্যকে কহিল,—আমি স্নান করতে চললুম—তুই চা ঠিক করে রাখ...

চায়ের কোনো প্রয়োজন ছিল না—তবু ফরমাশ্ করা! তার অর্থ, কুন্দ যদি চায়ের নামে আসিয়া উপস্থিত হয়! তা যখন আসিল না, তখন উচ্চ রবে চায়ের এই আদেশ—উদ্দেশ্য, কুন্দকে শুধু সাড়া দেওয়া। হয়তো সংসারের কি কাজে ব্যস্ত আছে...

স্নান করিয়া ঘরে আসিয়া বসিতে ভৃত্য চা আনিয়া দিল। কুন্দর দেখা নাই! অবনীর এবার বিরক্তি ধরিল। ভাবিল, দূর করো চা! ইচ্ছা হইল, পেয়ালা-সমেত চা ছুড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়! কিন্তু...না, চাকরটা কি ভাবিবে? সে পেয়ালায় মুখ দিয়া চায়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়া কহিল—মিষ্টি বেশী। তুই চা করেছিস্?

ভৃত্য কহিল—না।

গম্ভীর কণ্ঠে কহিল অবনী—না!

ভৃত্য কহিল—আমি ষ্টোভ জ্বালতে দিদিমণি এলেন। তিনি তৈরী করে দিলেন...

হুঁ! অথচ তিনি নিজে আসিতে পারিলেন না! অবনী কহিল,—আচ্ছা, তুই যা।

একবার মনে হইল, ভৃত্যকে বলে, দিদিমণিকে ডাকিয়া দে! কিন্তু না—জোর করিয়া কেন যত্ন আদায় করিবে? এত-খানি হীন ভিখারী হওয়ার মত দশা তার সত্যই হয় নাই!...

চা ভালোই লাগিল। চা তৈয়ারী করিতে কুন্দর নিপুণতা সত্যই আছে।...চা পান করিয়া অবনী লেখার খাতা লইয়া বসিল।...খাতার পাতা উল্টাইয়া দেখে, লিখিয়াছে, বসন্তকুমারের গৃহে হেমনলিনী আশ্রয় লইয়াছে—তার সংসারে একদম্ মিশিয়া আত্মীয়া হইয়া উঠিয়াছে! এই অবধি লেখা...তার পর?... বসিয়া খানিকটা কি ভাবিল। তার পর কলম লইয়া লিখিতে বসিল। কলম চলিল একেবারে বাধা-হীন স্রোতে। এক্সার্সাইজ্-বুকের পাঁচ-ছ' পাতা হু-হু বেগে ভরিয়া উঠিল। পঞ্চম পরিচ্ছেদ শেষ হইয়া গেল।

এবার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। নূতন পরিচ্ছেদের মুখেই বাঁধা...বিশাল পর্ব্বতের বাধা। লেখার গতি মন্থর রুদ্ধ হইল। তারপর লিখিবার যেন আর কিছু নাই—এইখানেই উপন্যাসের চলার পথে একেবারে পূর্ণচ্ছেদ টানা!...

খাতা বন্ধ করিয়া অবনী বসিল। এখনো কুন্দর দেখা নাই!

ব্যাপার কি? অভিমান?...ভাবিতে ভাবিতে তার বুকও অভিমানে ভরিয়া উঠিল।... বসিয়া থাকা গেল না। অবনী উঠিয়া অন্দরে চলিল।

মার ঘরে মা শুইয়া আছেন, তাঁর পাশে উপুড় হইয়া শুইয়া কুন্দ একখানা বাঁধানো মাসিক-পত্র খুলিয়া গল্প না উপন্যাস পড়িয়া মাকে শুনাইতেছে!...অবনী আসিয়া দাঁড়াইতে কুন্দ পড়া বন্ধ করিয়া ক্ষণেক তার পানে চাহিল, তারপর যেমন পড়িতেছিল...

অবনী ডাকিল—মা...

মা কহিলেন—আয় অবু...আমার কাছে বোস্। একটা গল্প শুনচি—ভারী চমৎকার রে। মেয়ের বিয়ে হয় না... তার জন্য লটারি খেলা। এক টাকায় এক শিশি তেল কিনে...

অবনী বুঝিল, কোন্ গল্প, কার লেখা! সে সেদিকে কোনো ইঙ্গিত না করিয়া বসিল, বসিয়া কহিল—আজ রাত্রে কিছু খাবো না মা, শরীরটা ভালো নেই।

মা উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন—সে কি রে? মাংস আনিয়েচি। কুন্দ নিজে কি নতুন রান্না রেঁধেচে...

অবনীর স্বস্তি মিলিল—বাঃ, চমৎকার চাল চালিয়াছে! অভিমান করিয়া যেমন কাছে আসা হয় নাই, তেমনি কেমন শোধ দিবার ব্যবস্থা! ...অবনী কহিল—শরীর থাকলে রান্না আর একদিন খাওয়া চলতে পারে।...একটু জোয়ানের

আরক আর বাইকার্বনেট অফ্ সোডা খেয়ে শুয়ে পড়বো। তাই বলতে এসেচি, আমার ঘুম যেন কেউ না ভাঙ্গায়!...বুঝলে?

মা কহিলেন—তাই কর্। পেট খারাপ করেনি তো? যে-রকম ঘুরচো সকাল থেকে...

অবনী সে কথার জবাব না দিয়া পাশের ঘরে গিয়া কাচের আলমারি খুলিল, খুলিয়া গ্লাশে জোয়ানের আরক ও খানিকটা গুঁড়া সোডা ঢালিয়া তাহাতে জল মিশাইল। পরে একটা চামচে সেটুকু ঘুঁটিতেছে, এমন সময় কুন্দ আসিয়া স্তম্ভিত ভাবে কাছে দাঁড়াইল, কহিল—নিজের এ কর্তামিটুকু না করলে কি চলতো না? আমি তো মরিনি, চোখে দেখলেন!

অবনী কহিল—তা দেখেচি বৈ কি!...তবে নিজে মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছিলুম—সে চলা বন্ধ করার দরকার বোধ করছিলুম কি না...

কুন্দ কোনো জবাব না দিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সোডা ও জোয়ানের আরকটুকু গলায় ঢালিয়া অবনী একবার কুন্দর পানে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, করিয়া নিঃশব্দ গম্ভীর মুখে চলিয়া গেল।

কুন্দ দাঁড়াইয়া রহিল—পাথরের মূর্ত্তির মত। তারপর ভ্রূকুটি করিয়া মনে মনে কহিল, বুঝেচি, এ অসুখ নয়—অভিমান! বেশ,—আমিও ও-ঘর মাড়াইব না। এমনি করিয়া মনে আঘাত দিয়া চলিবে...সে আঘাতে আনন্দ করিবে,—আর যে-বেচারী এ আঘাতে বিপন্ন হইয়াছে, তার একটু একান্তে থাকিবারো অধিকার

নাই...? ঔষধটুকুও নিজে লইয়া খাওয়া হইল? এই যে নিজে লইয়া ঔষধ খাওয়া...কুন্দ বুঝিল, শরীর সত্য খারাপ নয়। এ শুধু আঘাত দেওয়ার এক নূতন কৌশল!

বহুক্ষণ এমনি দাঁড়াইয়া থাকিবার পর হঠাৎ তার খেয়াল হইল, মিছা এ ঘরে দাঁড়াইয়া থাকা কি জন্য! ধীরে ধীরে সে গিয়া মার কাছে বসিল। মা কহিলেন—ওষুধ খেলে?

কুন্দ কহিল—হ্যাঁ।

মা কহিলেন—ও কিছু নয়। তবু থাক্—একটা রাত না খেলে ক্ষতি হবে না!...তোমার গল্পটা শেষ করে ফ্যালো, মা। তার পর মিছে আর রাত করে লাভ কি! তোমার খাবার দিতে বলো ঠাকুরকে—আমিও যা হোক কিছু মুখে দি—দিয়ে সকাল-সকাল শুই।

কুন্দ পড়িতে বসিল।...

পড়া শেষ হইলে আহারাদি সারিয়া উঠিতে রাত নটা বাজিয়া গেল। মা বলিলেন—একবার অবুকে দেখে আসি। তুমি মশারিটা ফ্যালো ততক্ষণ।

মা চলিয়া গেলেন। কুন্দ পাখার বাতাস করিয়া মশারি ফেলিল। এ-ঘরে মার কাছে এক-খাটেই কুন্দ শোয়।...

মশারি ফেলিয়া কুন্দ খড়খড়ির ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মা ফিরিলেন, ফিরিয়া কহিলেন—ঘুমোচ্ছে। কিছু তেমন নয়, সামান্য পেট-ভার হয়তো। আলো জ্বেলে শুয়েছিল, আলো নিবিয়ে দিয়ে এলুম।...আমরাও এবার শুয়ে পড়ি, এসো।...

বিছানায় শুইয়া কুন্দর ঘুম আর আসে না! বুকের মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে! সে আগুনের তাপে সব জ্বলিতেছে—যাতনার আর সীমা নাই। শুইয়া শুইয়া মা অবুর ছেলে-বেলার গল্প ফাঁদিয়া ছিলেন...

কুন্দ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া ছিল, মার গল্পে কোনো সায় দিল না। মা কহিলেন—ঘুমোলে?

কুন্দ কোনো জবাব দিল না। মা আপন-মনেই কহিলেন—ঘুমিয়েচে—বলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিলেন।... ...

বাহিরের দালানে বড় ঘড়িতে দশটা বাজিল।...পথে লোক-জনের কোলাহল—সাম্‌নে একটা পাণের দোকান, সেখানে প্রচণ্ড কোলাহল চলিয়াছে। চিন্তার গহনে কুন্দর মন বিপর্য্যস্ত-ভাবে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।...কত ভাবিবে?

কুন্দ এবার ঘুমাইবার প্রয়াস পাইল—চোখে ঘুম তবু ধরা দেয় না! সে যেন এ-দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! বিছানায় শুইয়া চিন্তার তীরে জর্জ্জরিত হওয়ায় কি বেদনা—তা সে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিল!...ওদিকে দালানের ঘড়িতে এগারোটাও বাজিল। মার নাসিকা-ধ্বনিতে কুন্দ বুঝিল, তাঁর নিদ্রা বেশ গাঢ়। সে উঠিয়া মশারির মধ্য হইতে বাহিরে আসিল—আসিয়া খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইল; চায়ের দোকানের সেই কালো ছোকরা রোয়াকে বাল্‌তি রাখিয়া চায়ের প্লেট ধুইতেছে।

কুন্দ নিঃশব্দ চরণে অবনীর ঘরে আসিল। ঘর অন্ধকার। খোলা খড়খড়ি দিয়া পঞ্চমীর চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরে

পড়িয়াছে। কুন্দ আসিয়া খাটের ছৎরী ধরিয়া দাঁড়াইল। মশারির মধ্যে বিছানায় অবনী পাশ ফিরিল, কহিল—উঃ!

ঘুমায় নাই!...কুন্দ টেবিলের কাছে আসিল। টেবিলের উপর উপন্যাস-লেখা খাতা খোলা পড়িয়া আছে। খাতাখানা জ্যোৎস্নার আলোয় মেলিয়া দেখে, এই যে, খানিকটা লেখা হইয়াছে। খাতাখানা লইয়া নিঃশব্দে সে বাহির হইয়া গেল।

অবনীর ঘর বাহিরের দিকে। এ ঘরের পর একটা বারান্দা। এই বারান্দা হইতে আর একটি বারান্দা গিয়াছে সোজা পূব দিকে...পূবের বারান্দা অন্দরের দালানে মিশিয়াছে—এবং এই দালানের কোণে তিনখানা ঘর। দক্ষিণের বড় ঘরখানি মার অধিকারে।...

খাতা লইয়া কুন্দ অন্দরের দালানে আসিল, আসিয়া সুইচ্ টিপিয়া আলো জ্বালিল—এবং দেওয়ালে পিঠ ঠেশিয়া বসিয়া উপন্যাসের খাতা খুলিল।...

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।...অভিমানের পাথর সরাইয়া মন আনন্দে-কৌতূহলে ভরিয়া উঠিল। ফিরিয়া আসিয়া লেখা হইয়াছে! শরীর খারাপ বলিয়া খাওয়া হইল না, অথচ লিখিতে এতটুকু বাধিল না।...

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বেদনার দান

কুন্দ নিবিষ্ট মনে বসিয়া 'সাহসিকা'র পঞ্চম পরিচ্ছেদ পড়িতেছিল। তার রাগ ধরিল,—অবনী যা-তা লিখিয়াছে। এবং যা লেখা হইয়াছে, তা শুধু কুন্দকে বেদনা দিবার উদ্দেশ্যে! এ পরিচ্ছেদের মর্ম্ম—বসন্তকুমার হঠাৎ একদিন বন্ধুর দলে পড়িয়া ম্যাচ্ দেখিতে যায়; ফিরিবার মুখে হেমনলিনীর ফরমাশ্-মত ধর্ম্মতলার এক দোকান হইতে কতকগুলা কার্পেট ও উল কিনিয়া যেমন ট্রামে উঠিবে, অমনি পিছন হইতে এক বাস্ আসিয়া ধাক্কা দেয়। সে-ধাক্কায় পড়িয়া রীতিমত জখম হইয়া সে হাসপাতালে যায়। হাসপাতালের ডাক্তাররা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে, প্রাণে বাঁচিবে, কিন্তু জন্মের মত চোখের দৃষ্টি খোয়াইতে হইবে! বাকী জীবনটুকু সে অন্ধ হইয়াই থাকিবে। হাসপাতালে হেমনলিনী আসিয়াছে, বসন্তর মা আসিয়াছেন। পরিচ্ছেদের একদম্ শেষে বসন্ত বলিল—অন্ধ হয়ে বাঁচতে চাই না! হেমনলিনী কাঁদিয়া বসন্তকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—আপনাকে

বাঁচতেই হবে। আমার চোখে জগৎ দেখবেন। আমি আপনার পায়ের পাশে দিবারাত্র পড়ে থাকবো। আপনার সেবাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

কুন্দর রাগ ধরিল,—ইচ্ছা হইল, খাতার এ পরিচ্ছেদটুকুর উপর কালি লেপিয়া পাতাগুলা ছিঁড়িয়া কুচি-কুচি করিয়া পথে ফেলিয়া দেয়! হাতে কলম ধরিয়াছ বলিয়া এমনি যা খুশী লিখিবে,—বটে!...

কিন্তু কালি লেপা হইল না, পাতাও ছেঁড়াও গেল না...সহসা পাশে কে ডাকিল,—কুন্দ...

—কে? চমকিয়া মুখ তুলিয়া কুন্দ চাহিয়া দেখে, অবনী!

অবনী কহিল,—আমায় না বলে আমার খাতা এনেচো! এ রীতিমত চুরি!

কুন্দ কহিল—বেশ করেচি, খুব করেচি। আমার কথা লিখচেন বলেই এ-খাতায় আমার অধিকার আছে। আর...

—আর কি, শুনি?

কুন্দ কহিল—আপনাকে এ-রকম যা-তা লিখতে আমি দেবো না। তাছাড়া ভারী তো লেখা! অন্য লোকের উপন্যাস থেকে প্লট চুরি! এতে লেখকের গৌরব হয় না, বাহাদুরিও প্রকাশ পায় না!

অবনী সাশ্চর্য্যে কহিল—প্লট চুরি!

কুন্দ কহিল—নয়?...এই মোটর এ্যাক্সিডেণ্ট? সেই অমল হাসপাতালে পড়ে রইলো, আর পাপিয়া তার সেবায় প্রাণ ঢেলে দিলে। 'পিয়ারী' উপন্যাসে!...কিন্তু হেমনলিনী 'পিয়ারী'

নয়! তার বয়ে গেছে সারা জীবন ঐ অন্ধ বসন্তর সেবা করতে!

অবনী কহিল—একে চুরি বলে না। মোটর-এ্যাক্সিডেণ্ট পথে নিত্য ঘটচে। তাছাড়া হেমনলিনী যা বলেচে, সেটা যে তার মুহূর্ত্তের খেয়াল নয়, তা তোমায় কে বললে?...ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঐ হেমনলিনী কি মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়ায়, পড়ে দেখো।...ঘুম ভেঙ্গে যেতে সেই কথাই ভাবছিলুম...

কুন্দ ঝাঁজালো স্বরে কহিল—হেমনলিনীকে কি করবেন, শুনি?...পিশাচিনী?...শয়তানী? সে বসন্তর মাথা কেটে সেই কাটা মুণ্ডু হাতে নিয়ে ধেই-ধেই তাণ্ডব-নাচ নাচছে?

কুন্দর ভঙ্গিমা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া অবনীর হাসি পাইল। কিন্তু হাসি চাপিয়া গম্ভীর কণ্ঠে সে কহিল—না মশাই, মুণ্ডু কাটলেই পিশাচিনী হয় না।...তা নয়। ঐ বসন্তর এক বন্ধুর প্রেমে বিভোর হয়ে তাকে সে বিয়ে করলো, বিয়ের পর তার সঙ্গে চলে গেল...বেচারী বসন্ত অন্ধ নয়ন নিয়ে জলে ডুবে মলো। প্লটটা এই। শুয়ে শুয়ে আদরাটুকু মনে ছকে ফেলেচি।

কুন্দ তীব্র দৃষ্টিতে অবনীর পানে চাহিয়া রহিল, পরে বেশ ঝাজালো সুরেই কহিল—লিখুন আপনার যা খুশী...আমি ও লেখা পড়বো না। সাধ্য-সাধনা করলেও না...

বলিয়া খাতাখানা সবলে একদিকে নিক্ষেপ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৃদু হাস্যে অবনী কুন্দর হাত ধরিল, ডাকিল,—কুন্দ...

ঝট্‌কা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া কুন্দ কহিল,—ছাড়ুন, আমার ঘুম পাচ্ছে।

অবনী কহিল—তোমায় ঘুমোতে দেবো না...

কুন্দ কহিল—কি আদেশ পালন করতে হবে, শুনি?

অবনী কহিল—চলো আমার ঘরে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের একটা আদ্‌রা মাথায় এসেচে, তোমায় বলবো...শুনবে।

কুন্দ কহিল—কোনো দরকার নেই। নিরাশ্রয় আমি পথে পড়েছিলুম—আমায় আশ্রয় দিয়েচেন—এ মস্ত দয়া, খুব মহত্ত্ব—তার জন্য আজীবন দাসী হয়ে এখানে পড়ে থাকবো। কিন্তু দাসীরও মন আছে...সে মনে বেদনা আছে, দুঃখ আছে—এ কথাটুকু আপনিও মনে রাখবেন।...কুন্দর স্বর অভিমানের বেদনায় কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

অবনী চমকিয়া উঠিল—কি কথায় কি কথা!...সে অপ্রতিভ হইল, এবং কণ্ঠের স্বর যথাসাধ্য কোমল করিয়া ডাকিল—কুন্দ...

কুন্দ কহিল,—আমি মুখ্যু, অনাথা।...অত বড় বড় কথার মানেও বুঝি না।...পরামর্শ করতে যদি হয় তো ঐ বি-এ পাশ নির্ম্মলা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন।...সারা দিনেও সে পরামর্শ শেষ হলো না? আবার আমার কাছে এসেচেন পরামর্শ করতে!...

তার স্বর বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল; দুই চোখে বেদনার অশ্রু ঠেলিয়া আসিল। চোখে আঁচল চাপিয়া ঘরে গিয়া কুন্দ বিছানায় শুইয়া পড়িল।

অবনী বহুক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাতাখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।...

সারা রাত কুন্দর বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়াই কাটিল। এ কি নাগপাশের বন্ধন! কেন এমন হয়? এ গৃহে সে আশ্রিতা...সে-কথা কেন ভোলে?...স্নেহে মায়ায় তার কোনো দাবী নাই! মনে করিলে ইঁহারা দাসীর মত গৃহের একধারে তাকে ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন! তা না করিয়া একেবারে গৃহের আদরিণী মেয়ের অধিকারে গৌরবিনী করিয়াছেন!... ইহাতেও তার তৃপ্তি নাই? প্রতিপদে সমানে পা ফেলিয়া চলিতে চায়? এ কি তার স্পর্দ্ধা! বামন হইয়া আকাশের চাঁদে লোভ!...সত্যই তো, যা খুশী, কেন তিনি না করিবেন? কুন্দর কি এক্তিয়ার আছে, তা লইয়া তর্ক তোলে?... শিবপুরে যাওয়ার সাধ কুন্দর হইয়াছিল। দয়া করিয়া উনি লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন! হাতে কাজ ছিল না, তাই! তার পর ওদিকে নির্ম্মলা দেবী দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার প্রস্তাব তুলিলে যদি দক্ষিণেশ্বরেই যান্—সমানে-সমানে আলাপ, প্রীতি... সে-যাওয়ায় আনন্দ আছে। সে আনন্দ তার সঙ্গে শিবপুরে গেলে মিলিত না! তাই শিবপুরে যাওয়া বন্ধ রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন! ইহাতে তার দুঃখ হয় কি বলিয়া? কিসের স্পর্দ্ধায়?...

এমনি চিন্তা তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া তার মনকে বিধ্বস্ত

চূর্ণ করিয়া দিতেছিল !...সে যেমন, কেন তেমন থাকে না ! এ দুঃখ ?...এ দুঃখ সে সাধ করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে। কবে এর পর অবনীর বিবাহ হইবে, রূপসী তরুণী বধূ গৃহে আসিবে—তার তৃপ্তি-সাধনে অবনী হয়তো দুনিয়াকেই তার পায়ের তলায় আনিয়া দিবে ! তখন কুন্দ এমনি রাগিয়া বাঁকিয়া মুখ ভার করিয়া কথার বাণে অবনীকে পীড়িত, জর্জ্জরিত করিবে না কি ? যে ভাবে তার মন স্পর্দ্ধায় ভরিয়া উঠিতেছে, তেমন ঘটা বিচিত্র হইবে না !...

এই দুঃখ-বেদনায় মানুষের মন ছেঁচিয়া পিষিয়া চুর হইয়া যায়। ভাগ্যে এ দুঃখ-বেদনায় বিধাতার করুণা-দৃষ্টি পড়ে...! ভাবিতে ভাবিতে ভাবনা যখন গাঢ় হইয়া মনকে চাপিয়া ধরিল, তখন এই ভাবনার ভারের মধ্য দিয়াই নিদ্রা তার জন্য আরাম বহিয়া আনিল ! কুন্দ ঘুমাইয়া বাঁচিল।...

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে কুন্দ দেখে, মা বিছানায় নাই। ঘরে বেশ রৌদ্র। কোনো দিনই তার উঠিতে দেরী হয় না—সকলের আগে ঘুম ভাঙ্গে।...আজ...? সে কেমন কুণ্ঠিত হইল।

মুখ ধুইয়া ধীরে ধীরে ধীরে আসিয়া সে অবনীর ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। অবনী তখনো বিছানায় পড়িয়া আছে। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, তবু...কেমন আলস্যের ভাব !

কুন্দ আসিয়া একেবারে অবনীর পায়ে হাত রাখিল। অবনী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, কহিল,—কে ?...কুন্দ !

গাঢ় কণ্ঠে কুন্দ কহিল,—হ্যাঁ, আমায় ক্ষমা করুন। কালকের মত স্পর্দ্ধা আর কখনো প্রকাশ করবো না।...

অবনী তার হাত ধরিয়া তাকে শয্যাপ্রান্তে টানিয়া বসাইল, বসাইয়া কহিল—কাল রাত্রে বেদনা দিয়ে তৃপ্তি হয় নি? আজ সকালে উঠেও তাই...

হতাশ নয়নে কুন্দ অবনীর পানে চাহিল—তার বুক একেবারে হা-হা করিয়া উঠিল। কুন্দ কহিল,—তা নয়। কাল যা-তা বলে আপনার মনে সত্যই বেদনা দিয়েচি—অন্যায় করেচি। নিজেও কম বেদনা পাই নি! কত রাত্রি অবধি বিছানায় শুয়ে ছটফট করেচি...কত বার মনে হয়েচে, এসে ক্ষমা চাই! আসিনি,—পাছে আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দি!

অবনী কহিল—আমিও রাত তিনটে পর্য্যন্ত ঘুমোতে পারিনি, কুন্দ...

কুন্দ কহিল—এমন অপরাধ আর কখনো হবে না।

লাঞ্ছিত বেত্রাহত কুকুরের মত কাতর দৃষ্টিতে কুন্দ অবনীর পানে চাহিয়া রহিল। অবনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—সত্যি, আমার ভারী অভিমান হয়েছিল! বাড়ী ফিরলুম, একবার তুমি এলে না!

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কুন্দ কহিল—চা আমিই তৈরী করে পাঠিয়েছিলুম।...আসতে পারিনি, মনে...কিন্তু সে কথা থাক্! বলচি তো, আর কখনো এমন অপরাধ হবে না!

অবনী কহিল—তুমিও কিছু মনে করো না, কুন্দ। অভিমান জিনিষটা বদ, মনের মধ্যে শুধু আগুন জ্বেলে দেয়। অভিমানে গুম্ হয়ে না থেকে স্পষ্টাস্পষ্টি যদি আমরা মনের বোঝা নামাই,

তাহলে বহু দুঃখ থেকে নিস্তার পেতে পারি! তাতে তর্ক ওঠে, কলহ বাধে,—তবু সে ভালো!

উদ্যত নিশ্বাসটাকে কুন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিল না; নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—মুখ-হাত ধুয়ে নিন্। আমি চা তৈরী করে আনি...

কুন্দ চলিয়া গেল। অবনী চুপ করিয়া খাটে বসিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, এই কুন্দ...একটু অবহেলা বোধ করিয়াছে, অমনি তার আর অভিমানের সীমা নাই! বেচারী! ইহার পর কোথায় বিবাহ হইবে—যদি সেখানে কোনো কারণে এতটুকু অবহেলা, এতটুকু অযত্ন পায়, বেদনায় কতখানি অভিভূত হইবে! তার সে-বেদনা সেখানে কে বুঝিবে?...

যথাসময়ে চা আসিল। চা পান করিতে করিতে অবনী কহিল—তুমি চা খাবে না, কুন্দ?

কুন্দ কহিল—আমি চা খাই না।

—খাও না! অবনীর স্বরে বিস্ময়!

—না। বলিয়া কুন্দ শূন্য পেয়ালা লইয়া গমনোদ্যত হইল।

অবনী তাকে ডাকিল, কুন্দ থমকিয়া দাঁড়াইল। অবনী কহিল—এঁটো পেয়ালা চাকররাই চিরদিন নিয়ে যায়। তুমি হঠাৎ তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করলে কেন?

কুন্দ কহিল—আপনার তাতে অপমান বোধ হয়?

অবনী কহিল—হয় বৈ কি! আমার ছোট বোন্ এ-দাস্য করবে, আমার চোখে বিশ্রী ঠেকে...

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কেমন এক দৃষ্টিতে কুন্দ অবনীর পানে চাহিল, তার পর হাসিয়া চলিয়া গেল।

পেয়ালা মাজিয়া ধুইয়া তুলিয়া রাখিয়া কুন্দ একেবারে নীচে নামিয়া আসিল। নীচের দালানে মা বসিয়া তেল মাখিতেছেন, তাঁর কাছে বসিয়া এক প্রৌঢ়া রমণী—বিধবা, অচেনা।

কুন্দকে দেখিয়া মা কহিলেন—এইটি আমার মেয়ে...সুশ্রী নয়?

কুন্দর পানে চাহিয়া প্রৌঢ়া কহিল—বসো তো মা, দেখি।

কি-এক অজানা ভয়ে কুন্দর বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ার পানে চাহিয়া রহিল। মা কহিলেন,—বসো মা।

কুন্দ বিনা-প্রশ্নে বসিল। প্রৌঢ়া তাকে বেশ ঠাহর করিয়া দেখিয়া তার চিবুকে হাত রাখিল, রাখিয়া জহুরী যেমন মণি-রত্ন পরীক্ষা করে, তেমনি ভাবে সন্ধানী দৃষ্টি তার মুখে বুলাইয়া কহিল—চমৎকার মেয়ে!...এ মেয়ে খুব পছন্দ হবে।... দেওয়া-থোওয়া তো যেমন বলেচো, মা?

মা কহিলেন—পাত্রটি কিন্তু মনের মত চাই, বাছা। দেওয়া-থোওয়ায় বাধবে না। আমার পেটের মেয়ে হলে যা দিতুম, তাই দেবো।

কথাগুলা স্পষ্ট। এ কথার অর্থ কুন্দ বুঝিল। এবং এই প্রৌঢ়ার পরিচয়ও তার কাছে অগোচর রহিল না—ঘটকী! ব্যাপার বুঝিতে তার বুক ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। অথচ এ ব্যথা প্রকাশ করিবার উপায় নাই!

সে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল, তার সামনে প্রভাতের এই নব-জাগ্রত আলোর রশ্মি কেমন ধোঁয়াটে হইয়া আসিল!

মা কহিলেন—অবু উপরে আছে?

কুন্দ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আছে।

মা কহিলেন—তাকে চা খাইয়ে আসচো বুঝি? কাল রাত্রে অসুখ করচে বললে...

মৃদু স্বরে কুন্দ কহিল—ভালো আছেন।

মা কহিলেন—তাকে একবার ডেকে দাও তো মা।...শুধু এখানে আসতে বলো—আর কিছু বলতে হবে না। তা ছাড়া তুমি তা বলবে না...তোমায় আমি চিনি তো!

কুন্দ ভাবিল, এ তাকে দিয়াই যেন তার মৃত্যু-বাণ বহানো হইতেছে! কিন্তু মার আদেশ—অমান্য করা চলে না।

ঘরে অবনী তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কুন্দ আসিয়া কহিল—মা ডাকচেন।

—কেন?

কুন্দ কহিল—আমার মরণের পাখা গড়িয়ে দেবার জন্য...

অবনী বুঝিল না, কহিল—সে কি?

কুন্দ কহিল—অনেক দিন সুখভোগ করচি। এখন আমার বিদায় নেবার পালা এসেচে—তার বাঁশী আপনাকে বাজাতে হবে কি না, তাই...

অবনী উঠিয়া কুন্দর কাছে আসিয়া তার গলায় হাত দিয়া গলা একটু টিপিয়া ধরিল, ধরিয়া কহিল—সত্যই দেখচি তোমার

আস্পর্দ্ধার সীমা নেই!...এ সব কথা...? আমি ভাবি, স্কুলের বিদ্যা তো ঐটুকু—এত কথা শিখলে কোথা থেকে!

কুন্দ হাসিল। ম্লান হাসি। এ হাসি অশ্রুর চেয়েও বুঝি মর্ম্মান্তিক! কুন্দ কহিল—দুঃখে-কষ্টে যে শিক্ষা হয়, তার শিকি-শিক্ষাও আপনারা স্কুল-কলেজে পান না!

এ কথায় অবনীর বুকে আঘাত বাজিল। এত স্নেহ—তার মধ্যেও কুন্দ কেন যে তার সেই অতীত দুর্দ্দিনকে এমন আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়! সে কহিল—আবার ঐ পুরোনো কথা! কত দিন বলেচি...

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কুন্দ কহিল—কি করবো! যার ভবিষ্যৎও অন্ধকার—কি দেখে সে তার সে-অতীত ভুলবে?

অবনী কহিল—কে বললে, তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার?

কুন্দ কহিল—আমি নিজে জানি...

অবনী কহিল—তুমি ছাই জানো! জানবার মধ্যে জানো শুধু ডেঁপোমি!

কুন্দ প্রতিবাদ তুলিল না, শুধু কহিল—মা ডাকচেন,...

অবনীর কেমন কৌতূহল হইল। সে কহিল—কেন? শিবপুরে যাওয়ার কথা আছে আজ, তাই...না?...বেশ, আমি রাজী।

কুন্দর বুকে এত নিশ্বাসও জড়ো হইয়াছিল! সে-নিশ্বাস রোধ করিয়া কুন্দ কহিল—সে জন্য নয়। আমার বিয়ে হবে—ঘটকী এসেচে। তাই...

অবনী চমকিয়া উঠিল। কুন্দ হাসিল, হাসিয়া কহিল—বুঝলেন তো। বিদায়ের বাঁশী আনন্দের সুরে ভরে নিন্।... এবার নিশ্চিন্ত হবেন—কেউ আর জ্বালাতন করবে না।

কথাটা বলিয়া কুন্দ বিদ্যুতের গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অবনী বিমূঢ়ের মত ক্ষণেক দাঁড়াইয়া মার কাছে চলিল।...

মা বলিলেন—আজ একটি পাত্র আসচে কুন্দকে দেখতে। পাত্রটি ভালো—বয়স বেশী নয়, পয়সা-কড়ি আছে রে। তোর পছন্দ হবে।

অবনী কহিল—আগে দেখি।...পাত্র নিজে আসচে ?

মা কহিলেন—হঁ্যা।

অবনী কহিল—কখন ?

মা ঘটকীর পানে চাহিলেন। ঘটকী সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া কহিল—সকালেই...বেলা সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে।

মা কহিলেন—তুই বাবা কোথাও বেরুস্ নে। না থাকলে কে কথা-বার্ত্তা কবে ? কে-বা পাত্র পছন্দ করবে ? তুমিই তো ওর অভিভাবক। দেখে-শুনে কুন্দর বিয়েটি তোমাকেই দিতে হবে !

অবনী কহিল—বেশ।

মার কাছ হইতে নিজের ঘরে আসিয়া অবনী আবার চুপ করিয়া বসিল। কুন্দর এ পাত্র পছন্দ নয়, বোধ হয় ! পছন্দ হইলে অমন কথা বলিবে কেন ?...কিন্তু কুন্দ তো পাত্রকে দেখে

নাই! তবু...বেশ, কুন্দকে চুপি চুপি ডাকা যাক্। ডাকিয়া তার মতামতটুকু...

অবনী ডাকিল,—কুন্দ—

উত্তর মিলিল—কেন?

উত্তর শুনিয়া অবনী বুঝিল, কুন্দ স্নানের ঘরে।...অবনী কহিল—স্নান করচো?

—হ্যাঁ।

—স্নান হলে আমার কাছে এসো। দরকার আছে।...

অবনী কুন্দর বিবাহের চিন্তা করিতে লাগিল।...হাস্যময়ী কুন্দ...যদি পাত্র পছন্দ হয়—কুন্দ খুশী হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে বেদনাও বোধ হইল। হাস্যে-ভাষ্যে কুন্দ তার সখী, সহচরী হইয়া উঠিয়াছে—চমৎকার বুদ্ধিমতী! অমন হতভাগা মামার ঘরে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়িয়া থাকিলেও তার স্বাভাবিক বুদ্ধি এতটুকু মলিন হয় নাই! আহা, সুখী হোক কুন্দ!...সত্যই বলিয়াছে, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শুধু তার কেন? এই মেয়ে-জাতটা...! তাদের সামনে ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট অন্ধকারে ভরা বৈ কি! নিজেদের হাত নাই। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিবে স্বামী—যে-স্বামীর কোনো পরিচয় জানে না! কোথা হইতে কে আসিয়া জীবন-পথে উদয় হইবে...! এ যেন লটারির খেলা! কারো ভাগ্যে সীমা-হীন সুখ, অবাধ আনন্দ! আর কারো বা জীবনের যা-কিছু দীপ্তি, দ্যুতি ঐ স্বামীর তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে নিবিয়া জীবনকে অন্ধকারে ভরিয়া তোলে!...

কুন্দ স্বামীর গৃহে গেলে তার জন্য অবনীর বড় মন কেমন করিবে! সে এই নিঃশব্দ পুরীতে অনেকখানি প্রাণের হিল্লোল বহিয়া আনিয়াছে! মাও কি তার অভাব অনুভব করিবে না? অথচ উপায় নাই! কিন্তু তাদের আনন্দের জন্য কুন্দর ভবিষ্যৎ-টুকুকে অনির্দ্দেশের মধ্যে ফেলিয়া রাখা চলে না।

এমনি চিন্তার মধ্যে একরাশ ভিজা কালো চুল পিঠে ফেলিয়া আলোর ঝলকের মত কুন্দ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। কহিল—কেন ডাকছিলেন?

অবনী তাকে লক্ষ্য করিল, কহিল,—ভালো পাত্র না হলে বিয়েয় মত দেবো না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

হাসিয়া কুন্দ কহিল,—আর আমার যদি পছন্দ হয়?

অবনী অবাক! কুন্দ কহিল—মিছে বাধা দেবেন না। একটা গতি আমার হওয়া চাই। যখন বাঙালীর ঘরে মেয়ে-জন্ম নিয়েচি, তখন বিয়ে না দিলে যে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে...নয় কি? বলিয়া কুন্দ উচ্চ হাস্য করিল; এবং অবনীর চমক ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই সে কহিল—যাই, সাজ-সজ্জা করিগে। —মার হুকুম হয়েচে, ভালো করে পাতা কেটে চুল আঁচড়াতে হবে, তার পর বোম্বাই-ওলার দোকান থেকে আপনার কেনা সেই সিল্কের শাড়ীখানি পরতে হবে। বেলা আটটা ওদিকে বাজে ...দেরী না হয়!

অবনীর উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই কুন্দ হাসি-মুখে বিদায় লইল। অবনী কিসের চিন্তায় তন্ময় হইল।...

পাত্র আসিয়া দেখা দিল বেলা আটটা সাঁইত্রিশ মিনিটে। অবনী বসিয়া ঘড়ির পানে তাকাইতেছিল। পাত্র দেখিয়া সে অবাক! এ মূর্ত্তি মঞ্জরী অফিসে দেখিয়াছে না? মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গায়ে গরদের ঢিলা পাঞ্জাবি—যতখানি ঢিলা হইতে পারে,—পরিধানে সরু পাড় গরদের ধুতি, পায়ে সাণ্ডাল। যে-রকম বেশভূষা...পাত্রটি মাসিক-পত্রের হালের কবি না হইয়া যায় না!

অবনী কহিল—মশায়ের নাম?

পাত্র কহিল—শ্রী ভৈরবেশ্বর মিত্র।

অবনী কহিল—বিষয়-কর্ম্ম কি করা হয়?

মৃদু হাস্যে ভৈরবেশ্বর কহিল,—আমি কবি।

অবনী কহিল,—কবিত্বের উপর নির্ভর করে সংসার চালানো যাবে না তো...

হাসিয়া ভৈরবেশ্বর কহিল,—যা বলেচেন '...মানে, বাবা পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন...বেঙ্গল-পুলিশ। পয়সা-কড়ি কিঞ্চিৎ রেখে গেছেন। কাজেই কাব্য-চর্চ্চায় বাধা ঘটবে না।

অবনী কহিল,—তাই বলুন।...মঞ্জরীতে কবিতা লেখেন?

ভৈরবেশ্বর কহিল—লিখি। মঞ্জরী ছাড়া হালের আরো বহু কাগজে লিখি... সাপ্তাহিক, মাসিক।

—বটে!...তা বিবাহ আপনিই করচেন? না...আপনার কোনো বন্ধু?

ভৈরবেশ্বর কহিল—আমারও বিবাহে ইচ্ছা হয়েচে,—তা

ছাড়া আমার একটি বন্ধুও প্রস্তুত আছেন। তাঁর নাম শুনেচেন, নিশ্চয়—অপরাজেয় কথা-শিল্পী পরাগ বসু।

কথা-শিল্পীর বিশেষণ শুনিয়া অবনী হাসিল, কহিল—আপনারা সকলেই অপরাজেয়!

তখনি উত্তর মিলিল—আমাদের প্রতিভা অস্বীকার করতে পারেন? দেশে Renaissance-এর যুগ এসেচে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ আর টেঁকচেন না। অভিজাত-জীবনের মিথ্যা ছবি আঁকা অচল হয়ে এলো।...এমনি কথার তরঙ্গ ভৈরবের মুখে বন্যার বেগে বহিল।

বাধা দিয়া অবনী কহিল—দুজনেই তো একটি মেয়েকে বিবাহ করতে পারেন না!...অন্ততঃ তেমন বাসনা থাকলেও তা চরিতার্থ করা সম্ভব হবে না। কারণ, বাঙলার নারী এখনো আপনাদের এতখানি প্রগতি বরণ করতে পারেন নি! এবং মেয়েদের অভিভাবকরাও যখন তাতে যোগ দেবেন না...

ভৈরবেশ্বর হাসিল, কহিল—তা ঠিক নয়। মেয়েটি আমার পছন্দ হলে আমিই বিবাহ করবো। আমার আর পরাগের beauty সম্বন্ধে মতের একটু পার্থক্য আছে—যার মতের সঙ্গে এ-টাইপ মেলে...বুঝচেন কি না!

অবনীর রাগ ধরিল। সে কহিল—কিন্তু এ সর্ত্তে মেয়েকে বিবাহের সভায় দাঁড় করাতে পারবো না। এগ্‌জিবিশনে যেতে হবে তাহলে।...এতে নারীর অপমান...যেন সে বাজারের পণ্য! আপনারা নারী-প্রগতির সমর্থন করেন, অথচ...

মৃদু হাস্যে ভৈরবেশ্বর কহিল—নারী প্রেমের বস্তু! শুধু ভালোবাসায় ঘেরা থাকবে!—তাছাড়া এ মেয়েটির আরো attraction আছে। শুনেছি, পথে দুর্ঘটনা...

বাধা দিয়া অবনী কহিল—যে ঘটনাই ঘটুক, তিনি আমার ভগ্নী। আমার ভগ্নীকে যিনিই পছন্দ করুন, তাঁর মনে রাখা উচিত, তিনিও যেন পাত্র-হিসাবে যোগ্য হন্। সে যোগ্যতার বিচার এক্ষেত্রে আমি করবো।...

অবনীর স্বরে বেশ দৃঢ়তা। এইটুকু বলিয়া সে থামিল, পরে আবার কহিল—আর এক কথা...আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত—

ভৈরবেশ্বর অবিচল স্বরে কহিল—বলুন...

—পৈত্রিক টাকা-কড়ির কথা যা' বললেন, সেটা...

ভৈরবেশ্বর হাসিল, হাসিয়া কহিল—তা মন্দ নেই। ব্যাঙ্কের খাতা দেখাতে পারি, credit balance দেখে নেবেন।...অন্য বিষয়-কর্ম্ম করি না; কারণ রুচি নেই। আমার বাসনা, আজীবন কাব্য-চর্চ্চা!

—ও! অবনী হাসিল। তাচ্ছল্যের হাসি!

ভৈরবেশ্বর সে হাসি লক্ষ্য করিল, করিয়া কহিল—আমার কবিতার বই বাজারে মিলবে। বেশ বিক্রী আছে—পাব্লিশারের ওখানে গোপনে সন্ধান নিতে পারেন...

কথা থামিল, কারণ কুন্দ আসিল। বাহির হইতে মা তাকে ঠেলিয়া দিলেন। কুন্দ আসিয়া দাঁড়াইলে ভৈরবেশ্বর তার

পানে তাকাইয়া তাকে দেখিল, কহিল,—Yes, quite charming !...লেখাপড়া কত দূর শিখেচেন ?

অবনী কহিল—স্বামী আর সংসার—এ-দুটি বস্তুকে বেশ নিপুণ ভাবে manage করতে পারবেন। ডিগ্রী পান্‌নি—ম্যাট্রিকও পাশ করেন নি। তা না হলেও she is quite up-to-date.

ভৈরবেশ্বর ভঙ্গিম দৃষ্টিতে কুন্দকে দেখিল, দেখিয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল ; পরে কহিল—উনি যেতে পারেন।

অবনী কহিল—যাও কুন্দ...

কুন্দ চলিয়া গেল। ভৈরবেশ্বর কহিল,—পাত্রী পছন্দ। আমিই বিবাহ করবো। আপনি প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা কইতে পারেন—সেটা হিন্দু বিবাহের আনুসঙ্গিক ব্যাপার কি না... বলিয়া সে হাসিল।

অবনী কহিল—তার আগে খপর নি, পাত্রী আপনাকে পছন্দ করলে কি না...

—হুঁ !...আপনি বরং আমার এই 'দুপুরের বাঁশী' বই একখানি রেখে দিন—সঙ্গে এনেচি। ওঁকে পড়তে দেবেন। আমার যোগ্যতার পরিচয় আমার এই কাব্যে।—কথাটা বলিয়া ভৈরবেশ্বর হাসিল।...তারপর আরো দুই-এক কথার পর বিদায় লইল।...

তাকে বিদায় দিয়া অবনী অন্দরে আসিল। কুন্দ বেশ-পরিবর্ত্তনান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। অবনী হাসি-মুখে কহিল—কেমন পাত্র দেখলে, কুন্দ ?

কুন্দ অবিচল স্বরেই কহিল—মন্দ কি!

অবনী বিস্মিত হইল, কহিল—বলো কি কুন্দ? ঐ পাত্র...?

কুন্দ কহিল,—আমার পক্ষে বেশ বৈ কি! পয়সা-কড়ি আছে, শুনলুম...আমায় খেতে পরতে দিতে পারবে তো। মেয়ে মানুষ—একজনের হাতে তাকে পড়তেই হবে। সে রামই হোক, রহিমই হোক্! এর মধ্যে মেয়ের পছন্দ-অপছন্দর কথা উঠতে পারে না!

ম্লান জ্যোৎস্নার মত কুন্দর মুখে ম্লান হাসি। সে সরিয়া গেল। অবনী তার পানে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এই পাত্রের কথা লইয়া অনেকক্ষণ কৌতুক করিবে, ভাবিয়াছিল—বিশেষ এই কাব্য-গ্রন্থ যখন তার হাতে। কিন্তু কোনো কথা পাড়িবার পূর্ব্বেই কুন্দ সরিয়া গেল!...পাত্র তার পছন্দ হয় নাই—অবনী তা বোঝে। অবনীরও পছন্দ হয় নাই—কুন্দ কি তা বোঝে নাই? বুঝিয়াছে। এ পাত্রের হাতে পথের মেয়েকেও দেওয়া যাইতে পারে না...কুন্দ তো ঘরের মেয়ে—তার ছোট বোনের মত! মা কিম্বা অবনী এতটুকু প্রভেদ দেখে না। তবু...

অবনী একটা নিশ্বাস ফেলিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সন্ধিক্ষণ

মা আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—কেমন পাত্র রে অবু ?

অবনী কহিল—ছাই !

মা কহিলেন—কেন, ঘটকী যে বললে, পয়সা-কড়ি বেশ আছে। বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধবদের নিত্য পোলাও-মাংস খাওয়াচ্ছে —ধূম-ধাম লেগেই আছে।

অবনী হাসিল, কহিল—বাপ ছিল বেঙ্গল পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর—পয়সা-কড়ি কিছু রেখে গেছে, বললে। নিজে কিছু করে না,—বললে, কাব্য চর্চ্চাই জীবনের ব্রত ! পদ্য লিখে জীবন কাটাবে। তার যোগ্যতার পরিচয় এই কাব্য-গ্রন্থে—কথাটা বলিয়া মার হাতে 'দুপুরের বাঁশী' কাব্যখানা অবনী আগাইয়া দিল।

প্রসন্ন কৌতূহলে মা কহিলেন—কেমন লেখে ?

অবনী কহিল—ছাই! শুনবে? বলিয়া দুপুরের বাঁশী লইয়া অবনী পড়িল—একেবারে প্রথম পৃষ্ঠার কবিতা...

রাখাল ছেলে বাজিয়ে বাঁশী তেপান্তরের মাঠে ঘোরে।
সুরে তরুণ মনখানা মোর ছুট্‌লো পাশের বাড়ীর দোরে।
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ এই বেলা দুকুর, ধুঁকচে গোরু, ধুঁকচে কুকুর—
চুল শুকোতে ছাদে কে গো গায়ের বসন হাওয়ায় ওড়ে?

এইটুকু পড়িয়াই গম্ভীর মুখে অবনী কহিল—ছোটলেকে!... দেখচো তার যোগ্যতা! এর হাতে কুন্দকে দিতে পারবে?

মুখ বাঁকাইয়া মা কহিলেন—কে জানে, বাবু? এ-সব হলো ছেলে-বয়সের লেখা-লেখা খেলা। এই যে তুই লিখিস্...তা বলে কখনো কিছু কাজ-কর্ম্ম করবিনে কি? যে বয়সের যা...! উচক্কা বয়স, বাপের পয়সা-কড়ি আছে—এর পরে ঐ পয়সা কোনো আপিসে জমা রেখে একটা কেশিয়ারী-টারী...

—না!...অবনী মুখের যা ভঙ্গী করিল, তাহা হইতে মা বুঝিলেন, পাত্র অবনীর মোটে পছন্দ হয় নাই।...

দুপুরে আহারাদি সারিয়া অবনী সকৌতুকে 'দুপুরের বাঁশী' খুলিয়া পড়িতেছিল, কুন্দ আসিল—তার মুখ গম্ভীর। সকালের রঙীন হাসি ও খেলা-ধূলার পরশ মুছিয়া দুপুরের রৌদ্র-দগ্ধ প্রকৃতি যেমন গম্ভীর মূর্ত্তি ধরে, ঠিক তেমনি!...

অবনী কহিল—এই যে কুন্দ...তোমার নল-রাজার কাব্য-প্রতিভার পরিমাপ করচি।

কুন্দ হাসিল না। মুখে সেই অটল গাম্ভীর্য্য! কুন্দ কহিল—পাত্র অপছন্দ করা হয়েচে, শুনলুম...

অবনী অবাক! সে কহিল—ও কি পাত্র?...মাটীর ফুটো ভাঁড়...

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া কুন্দ কহিল—কেন, শুনতে পাই?

অবনী কহিল—এই 'দুপুরের বাঁশী' বই পড়লে বুঝবে।

কুন্দ কহিল—মা বলছিলেন, এ ওদের লেখা-লেখা খেলা। আপনি যে লেখেন, পাত্রীর বাজারে সেই লেখা নিয়ে কি আপনার যোগ্যতার বিচার হবে?...

সকালে মাও এমনি কথা বলিয়াছিলেন! সে কথা অবনী গায়ে মাখে নাই! এখন কুন্দর মুখেও ঐ কথা! সত্যই তাই? হয়তো...! ঐ ভৈরবেশ্বর যে-গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়াইতেছে, এই লেখাই তার পরিচয়—সে-গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া লোক-সমাজে আস্ফালন অবনী না তুলুক—তার মনের গর্ব্বটুকুও অমনি নয় কি?...

অবনী নিশ্বাস ফেলিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। কুন্দ ক্ষণেক উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আপনি এ বিয়ের ব্যাপারে কোনো কথা কবেন না!...মার অপছন্দ হয় নি। পয়সা-কড়ি আছে—পাত্র নেশা-টেশা করে না, বয়স অল্প, সুস্থ শরীর, ভদ্র ঘর—এতগুলো ভালো যখন এক সঙ্গে—তখন লেখার একটু খুঁতের দোহাই দিয়ে তাকে তাড়াবেন না। বিশেষ,

উপযাচক হয়ে সে পাত্র যখন আপনার দোরে এসেচে!... কাবুলের আমীর, কিম্বা তিব্বতের লামা বিয়ে করতে আসবে না! পথে কুড়োনো মেয়ে—এর চেয়ে ভালো পাত্র কোথায় পাবেন? পাগলামি করে একে তাড়াবেন না।

যত গম্ভীর মুখেই কুন্দ এ-কথা বলুক, এ কথার তলে-তলে অশ্রুর ফল্গু! অবনী তা বুঝিল, বুঝিয়া কুন্দর পানে চাহিয়া রহিল।

মৃদু হাসিয়া কুন্দ কহিল—মাথার উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়েনি, মা বসুন্ধরাও সত্যি পাতালে নেমে যান নি যে, অমন চোখে চেয়ে আছেন!...এ-বিয়েয় আপনি অমত করবেন না। এর বেশী মানুষ দেখে দিতে পারে না—এর পর যদি মন্দ ঘটে, সে মেয়ের বরাত!...

কুন্দ চলিয়া যাইতেছিল, অবনী ডাকিল—কুন্দ...

কুন্দ ফিরিল। অবনী কহিল—এত কথার মধ্যেও একটা কথা তো বললে না...

—কি কথা?

—এ পাত্র তোমার পছন্দ হয়েচে কি না!...সত্যি, তোমার যদি পছন্দ হয়ে থাকে...

কুন্দ কহিল—আমার আবার পছন্দ-অপছন্দ কি!...মামা যে-বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল, তাতে কি আমার মত চেয়েছিল? আমার আবার মতামত কিসের! আমি যদি মনে মনে ভেবে রাখি, স্বর্গ থেকে দেব-সেনাপতি নেমে আসবেন

আমায় বিয়ে করতে, তিনি ছাড়া আর কারো গলায় বর-মাল্য দেবো না—সে হবে খেয়াল! আমার সে খেয়ালে কর্ণপাত করা কি আপনাদের উচিত হবে? মানুষ আকাশ-কুসুম রচনা করে, জানি; কিন্তু আকাশে কুসুম সত্যি কখনো ফোটে না!

এ কথাটুকু বলিয়া কুন্দ আর মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না—চলিয়া গেল। উত্তরে অবনী কিছু বলিবে কি না, তার প্রত্যাশাও করিল না।

অবনী তেমনি মৌন, স্তব্ধ...ঘরের বাতাস যেন কুন্দর কথার সুরে বেদন-ব্যথায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! দুপুরের ধরণী একে ক্লান্ত—সে ক্লান্তি কুন্দর কথার সুরে চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিয়া অবনী ভাবিল, আমি মূঢ়, তাই কুন্দকে অমন প্রশ্ন করিয়াছিলাম! ও-পাত্র কুন্দর পছন্দ হইতে পারে না! কুন্দকে সে জানে—তার মন কত ঊর্দ্ধ লোকে বিচরণ করে... কি বিত্ত-ভরা তার চিত্ত!...মাও ও-পাত্র পছন্দ করিবেন না।

কিন্তু কুন্দ ও-সব কথা বলিল কেন? অভিমান! ইহাতে অভিমানের কি ছিল?...নিছক কৌতুক! অথচ...

সে চিন্তা-মগ্ন হইল।...সহসা একটা কথা...অবনী শিহরিয়া উঠিল। না, না, অসম্ভব—সে অসম্ভব!...

নিঃশব্দে আহারাদি চুকিল। একবার শুধু মা বলিলেন—তাহলে ও-পাত্র তোমার পছন্দ নয়? উত্তরে অবনী বলিল—না...

মা কহিলেন—আমার বুকে ভারী পাথর হয়ে বসে নেই কুন্দ

...তবু চেষ্টা-চরিত্তির চাই বৈ কি। মেয়ে...বাঙালীর ঘরে! বিয়ে দিতেই হবে।...আমি থাকতে-থাকতে বিয়েটি হয়, তাই না...

অবনী কহিল—কেন, কোথায় যাচ্ছো তুমি?

হাসিয়া মা কহিলেন—এখানে চিরদিন থাকবার ইজারা পাইনি তো!

অবনী কহিল—কেউই সে ইজারা পায় না, মা...

কুন্দ কাঠ হইয়া বসিয়াছিল। মার ও অবনীর কথাবার্ত্তায় তার সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাব! যেন মাটীর পুতুলকে কে দেওয়ালে ঠেশ দিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে!...

আহারাদির পর অবনী বিছানায় শুইয়া খপরের কাগজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—ভারতের রাজনীতিক আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের কি লক্ষ্য-হীন গতি! প্রত্যহ এই এক কথা—অথচ এ-সঙ্কটেও দলাদলির অন্ত নাই! হা রে স্বার্থান্ধ বাঙালী!

কাগজ ফেলিয়া সে উঠিল—এবং জামা গায়ে দিয়া গিরীনের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।...

বাহিরের ঘরে কৌচে বসিয়া নির্ম্মলা। তার হাতে একখানা ইংরাজী বই। অবনী কহিল—কি পড়চেন?

নির্ম্মলা বই মুড়িয়া কহিল—আপনি! তার স্বর মৃদু, সলজ্জ। নির্ম্মলা কহিল—এখানা? বার্ণার্ড শ'র কান্‌ডিডা।

অবনী কহিল—ওখানা আমি পড়িনি। কেমন?

নির্ম্মলা কহিল—বেশ লাগচে। এমন সাদা-সিধে ঘরোয়া

ব্যাপারের মধ্যে এতখানি মনস্তত্ত্বের ছবি...আশ্চর্য্য হয়ে যাই শক্তি দেখে!

অবনী কহিল—সত্যি, ও-সব বই পড়ে মনে হয়, আমাদের এই সব ধুরন্ধর মাটীর কেঁচো!...গিরীন কোথায়?

নির্ম্মলা কহিল—বেরিয়েচে। কি কারবার করবে...

অবনী কহিল—বটে! কিসের কারবার? ফিল্‌ম্-তোলা?

নির্ম্মলা কহিল,— না। পল্‌তার ওদিকে জমি নেবে। অজিত-বাবুর এক মামাতো ভাই ওখানে ডেয়রি-ফার্ম করেচেন। চাষ-বাস, হাঁস-মুর্গী পোষা—তার উপর যাদের গোরু দুধ বন্ধ করেচে, তাদের গোরু এনে ওখানে রাখা—গোরুর পালুনির জন্য মাসে পাচ টাকা করে চার্জ্জ নেয়; ঘুঁটে বিক্রী আছে—নানা ব্যাপার। পাঁচশো বিঘে জমি—আজ সকালে একত্র বসে হিসাব-নিকাশ হয়ে গেছে। অজিতবাবু আর দাদা আরো পাঁচশো বিঘে জমি নেবে...নিয়ে মস্ত কারবার গড়ে তুলবে। সেই জমি দেখতে গেছে।

অবনী কহিল—বাঃ! আমায় খপর দিলে আমিও যেতুম যে! ভারী চমৎকার আইডিয়া! পল্‌তায় ডেয়রি—একেবারে বাড়ীর দোরে! নিত্য যাতায়াত, দেখাশুনা করায় কোনো অসুবিধা ঘটবে না।...

নির্ম্মলা কহিল—বসবেন...?

অবনী একবার নির্ম্মলার পানে চাহিল—ও-মুখে আজ সে

বিরূপতার চিহ্ন নাই! বেশ সহাস দৃষ্টি, আলাপেও কেমন সহজ স্বচ্ছন্দ সুর!

অবনী কহিল—বসবো না। হ্যাঁ, কাল শরীর খারাপ বোধ করছিলেন! আজ...

সলজ্জ স্বরে নির্ম্মলা কহিল—ভালো আছি।

অবনী কহিল—তাহলে উঠি। আপনি বার্ণার্ড শ পড়ুন...

অবনী চলিয়া যাইতেছিল, নির্ম্মলা কহিল—একটা কথা ছিল...

অবনী ফিরিল, কহিল—বলুন...

নির্ম্মলা কহিল—কুন্দর ইতিহাস শুনলুম। আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?

হাসিয়া অবনী কহিল—দেবো। এ তো শক্ত কথা নয়।

নির্ম্মলা কহিল—একদিন এখানে নিয়ে আসবেন?...অবশ্য আমরা তার আগে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসবো—তাঁর আসতে অনিচ্ছা না থাকে এবং পাঠানোয় আপনাদের মত থাকে যদি...

—এতে অনিচ্ছা বা অমতের কি আছে...? বলিয়া অবনী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

পথে বাহির হইয়া সে ভাবিল, কোথায় যাই? গৃহে? না। কুন্দ যদি সত্যই...? হাসি পাইল। জীবনটা সত্যই কিছু পরাগ বসুদের লেখা উপন্যাস নয় যে একটু অন্তরঙ্গতায়...

পলতায় গেলে কি হয়? মন্দ কি!...কিন্তু কত বড় জায়গা ...সেখানে কোথায় মাঠ, কোথায় ডেয়রি...

মন কহিল, তাই চলো। খুঁজিয়া না পাও—মুক্ত হাওয়ায় বেড়ানো হইবে তো!...

ট্রামে চড়িয়া অবনী ষ্টেশনে চলিল। এবং সেখান হইতে ট্রেণ ধরিয়া পল্‌তায়।...

গিরীন তাকে একেবারে লুফিয়া হইল, কহিল—তুমিও যোগ দাও হে অবু...! মুক্ত বাতাসে লক্ষী হাসচেন! দেখে আমার সত্যিই তাক্ লেগে গেছে। প্রয়োজন শুধু একটি পুকুরের—জলের অভাব না ঘটে!

অবনী কহিল—এখানে এসে বাস করতে পারলে আরো ভালো। সহরের ধোঁয়া, কলরব ছেড়ে...

হাসিয়া গিরীন কহিল—যা বলেচো! ব্যবসা চলবে, তার উপর সন্ধ্যায় কল্পনা দেবীর সঙ্গে আলাপ! দ্বিধা করো না অবু—আমরা শুভকার্য্য সুরু করচি অবিলম্বে!...জায়গা-জমি দেখতে এসেচি। শুনচি, এই জমি বিলি হবে। পাশে আছেন অজিতের মামাতো ভাই উপেনবাবু।...চাই কি, নার্শারি অবধি করবো—কলকাতায় রোজ ফুল পাঠাবো...

অবনী কহিল—ভারী ভালো লাগচে, সত্যি! ব্যবসা-ব্যবসা করে অস্থির হই—তার পর ছুটি সাবান তৈরী করতে, নয় নতুন শিশিতে জার্ম্মান্ এসেন্স ঢেলে তাতে এখানকার প্রেশে-ছাপানো লেবেল এঁটে পার্ফিউমারী ফাঁদতে...মানুষ খেতে পাচ্ছে না, এত এসেন্স-সাবান কিনবে কোত্থেকে, সে কথা ভাবি না। কাজেই গণেশ বাবাজী বসতে না বসতে উল্টে পড়েন!

...সন্ধ্যায় সকলে কলিকাতায় ফিরিল। ফিরিয়া অবনী আর গিরীনের ওখানে হাজিরা দিল না—একেবারে বাড়ী গেল। তার মনে উৎসাহের বন্যা বহিয়াছিল! মার সঙ্গে এখনি এ ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া ফেলা চাই! দোতলায় উঠিয়া একেবারে তাই সে অন্দরে গেল। ঘর অন্ধকার। অবনী ডাকিল—মা...

ভৃত্য কহিল—মা বাড়ী নেই। ও-বাড়ী থেকে মেয়েরা এসেছিলেন বেড়াতে; যাবার সময় মাকে আর দিদিমণিকে নিয়ে গেছেন।

—ও-বাড়ী?

ভৃত্য কহিল—গিরীনবাবুর বাড়ী।

অবনী আরাম বোধ করিল। গিরীনের বাড়ীর মেয়েরা? তাহা হইলে গিরীনের স্ত্রী? নির্ম্মলাও...? অবনী জিজ্ঞাসা করিল—ক'জন মেয়ে-লোক এসেছিলেন?

ভৃত্য কহিল—দু'জন।

হুঁ। অবনী কহিল—কখন সব ফিরলেন?

ভৃত্য কহিল—সন্ধ্যার ঠিক আগে।

অবনী ক্ষণেক দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তার পর নিজের ঘরে চলিয়া গেল।...

টেবিলের উপর সাহসিকার খাতা পড়িয়াছিল। অন্যমনস্ক-ভাবে অবনী খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল।...উপন্যাসে মন নাই—পলতার সেই বাগান, বন! তারি শ্যামল ছায়া-তলে কত কাজের কল্পনা—সে কাজ যদি সফল হয়...!

বাহিরে মার স্বর শুনা গেল। ভৃত্যকে মা বলিতেছিলেন—আমি জানি, বাবু এসেচেন। তুই চা'টুকু করে দিতে পারিস্‌নে ?

বলিতে বলিতে মা আসিয়া তার ঘরে প্রবেশ করিলেন। অবনীকে কহিলেন—চা-টা কিছু খাস্‌ নে তো ?—ছাখো এদের কাণ্ডখানা !...কুন্দকে পাঠিয়েচি চা তৈরী করে আনতে !...ও-বাড়ীর গিরীন ফিরলো, তার মুখে শুনলুম, তুই পলতায় গেছলি—ওদের সঙ্গেই এখন ফিরেচিস। আর বসতে পারলুম না। সারাদিন কিছু মুখে দিস্‌ নে !...কি যত্ন ওদের ! মেয়ে দুটী ভারী ভালো ! বৌটি সদা হাস্য-মুখী...বৌই সংসারের গিন্নী ! এক পিশি আছে—শুচি-বাই—দিন-রাত কলতলায় বসে থাকে...

মা ও-বাড়ীর সুখ্যাতি সুরু করিলেন ; আরো বলিলেন—এত দিন পাশাপাশি আছি। তোর আলাপী !...অথচ যাওয়া-আসা নেই, আশ্চয্যি ! চমৎকার লোক ! গিরীন ছেলেটিও ভারী ভালো। একদণ্ডে একেবারে মা-মা করে কি খাতিরই করলে !...

কুন্দ চা আনিয়া দিল। অবনী কহিল—কুন্দকে দেখে কি বললে ?

মা কহিলেন—ওকে কি ছাড়তে চায় ?...কত যত্ন ! গিরীন বললে, সভা ডাকিয়ে আমরা আপনার গলায় বিজয়-মালা দেবো... এমন সাহস, এমন তেজ আপনার ! এই তো চাই ! মিন্‌মিনে কাঁদুনে বাঙালীর মেয়েগুলো আপনার কাছে শিখুক, নারীর তেজ কাকে বলে !

কুন্দর পানে চাহিয়া অবনী কহিল—নির্ম্মলার সঙ্গে আলাপ হলো, কুন্দ ?

কুন্দ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

—বেশ ভালো মেয়ে নির্ম্মলা ? নয় ?

কুন্দ আবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

অবনী কহিল—তোমাকেও স্কুলে ভর্ত্তি করে দিচ্ছি, দাঁড়াও না, স্কুল খুলুক...তুমিও ওর মত বি-এ পাশ দেবে একদিন...

কুন্দ অবিচল দাঁড়াইয়া রহিল। তার মুখ দেখিয়া মনে হয়, জীবন্ত নয়—যেন মাটীর পুতুল !

অবনী তা লক্ষ্য করিল। তার মনে বেদনা বোধ হইল।... কেন ? কেন কুন্দর মুখ অমন ম্লান ! সেদিনকার সে অভিমান এখনো ভাঙ্গে নাই ? কুন্দর মনকে একটু নাড়া দিবার অভিপ্রায়ে তার পানে চাহিয়া তাকে শুনাইয়া অবনী মাকে কহিল—পলতায় গিয়ে আজ ভারী উপকার হয়েচে, মা। চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকি, কাজ-কর্ম্ম করি না ! এখন কাজ-কর্ম্মের ইচ্ছা হয়েচে। তোমরা দুজনেই শোনো, বলি...হয়তো কলকাতার বাস তুলে সেইখানে থাকবো...

ভূমিকা ফাঁদিয়া আসল কথা সবিস্তারে পাড়িবার সে উপক্রম করিয়াছে, কুন্দ কহিল,—ময়দা বার করে এসেচি মা— মেখে ফেলিগে। আপনি বসুন। কথাটা বলিয়া কুন্দ তখনি সেখান হইতে চলিয়া গেল।...

অবনী অবাক ! তার বলার সমস্ত আগ্রহ সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া গেল। সে চুপ করিয়া রহিল।

মা কহিলেন,—একটা কথা আছে, অবু...

অবনী কহিল—বলো...

মা কহিলেন,—ওদের বড় সাধ, মানে, গিরীনের বৌ, গিরীন —দুজনেরই। বৌ আমায় বলছিল...

উপক্রমণিকা দেখিয়া অবনীর ঔৎসুক্য জাগিল। পলতার ব্যবসার কথা ওখানেও হইয়াছে, তাহা হইলে ? কিন্তু গিরীনের বৌ... ?

মা কহিলেন—নির্ম্মলা মেয়েটি বেশ—না ?

অবনী কহিল—হুঁ। কেন বলো তো ?

মা কহিলেন—বৌ বলছিল—ওদের দুজনের বড় সাধ, নির্ম্মলার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়...এ-কথা নিয়ে আমার কাছে আসবে-আসবে করছিল...আসেনি।...হঠাৎ বিয়ের কথা পাড়বে ! তা, কুন্দর কথা শুনেচে—কুন্দকে দেখতে দুজনের খুব সাধ ! সেই ছলে এসেছিল। বৌ বললে, নির্ম্মলাকেও সঙ্গে এনেছিল, আমি তাকে দেখবো—তাই।...তা তোর মত আছে তো ?... লক্ষ্মী মাণিক আমার, এতে অমত করিস্‌নে...তুইই তো কত বার বলেচিস, মেয়েটি ভালো ! অমন লেখাপড়া জানে ! লেখা-পড়া-জানা মেয়ে তোর পছন্দ !...তা কি বলিস্ ? আমি উদ্যোগ-আয়োজন করি তাহলে...?

অবনী কি উত্তর দিবে ! এ কথায় তার চোখের সামনে

হইতে সমস্ত পৃথিবী যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! নিশ্বাস বন্ধ হইয়া বুকটাকে এমন ফাঁপাইয়া তুলিল যে সে-ফাঁপে চেতনা অবধি বিলুপ্ত হইবার জো! সে কোনো কথা না বলিয়া স্থির নিস্পন্দ বসিয়া রহিল।...

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিয়ের ফুল

রূপে-রসে ভরিয়া দুনিয়া রঙীন হইয়া উঠিয়াছে! আহারাদির পর বিছানায় বসিয়া অবনী আকাশের পানে চাহিয়াছিল...এক আকাশ নক্ষত্র...ঐ চাঁদ...! বাতাসেও আজ কি আরাম!

বসিয়া সে মনের পটে ছবি আঁকিতেছিল, সেই বনের প্রান্ত, তৃণে-ছাওয়া আঁকা-বাঁকা সরু পথ, পথের ধারে বাগান, বাগানের মধ্যে পরিচ্ছন্ন একখানি বাঙলো! বাঙলোর বারান্দায় বেতের চেয়ার—চেয়ারে বসিয়া অবনী...ঘরে নির্ম্মলা কত-কি কাজ করিতেছে। চালানীর হিসাব, কৃষাণের মাহিনা, নূতন জমির লীজ...। সারা দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া অবনী কাজ দেখিয়া বেড়ায়—কাজের শেষে বাঙলোয় ফেরা...নির্ম্মলার তখন কি সেবা, কি পরিচর্য্যা!...রাত্রে এমনি নক্ষত্রের রাশিতে আকাশ ভরিয়া ওঠে, বাঙলোর ঘরে আলো জ্বলে,—সে আলোয় বই খুলিয়া অবনী আরাম-চেয়ারে বসে। মন কিন্তু বইয়ের পাতায় থাকে না—নির্ম্মলা পিয়ানোর ধারে বসিয়া গান গায়—সেই গানের

স্বরে-স্বরে অবনীর মন ঘুরিতে থাকে! কি মায়া-লোকেরই না সৃষ্টি করিয়াছে দুজনে!

স্বপ্ন-বিভ্রমে মন পরিপূর্ণ, কুন্দ আসিয়া কহিল—মশারি ফেলে দি?...স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। নিশ্বাস ফেলিয়া অবনী ডাকিল—কুন্দ...

কুন্দ কহিল—হ্যাঁ, আমি।...আপনি কি ভেবেছিলেন?

অবনী কহিল—শুনেচো কুন্দ, নির্ম্মলা...

কুন্দ কহিল—শুনেচি। মা বলছিলেন, আপনারো মত আছে। ভালো।

অবনী কহিল—এইবার তোমার বিয়ে দেবো। বিয়ের পর পড়াশুনা কেন হবে না? তোমার বরের সঙ্গে আমার সর্ত্ত থাকবে...

কুন্দ কহিল—সে যা করবার, করবেন। মশারিটা ফেলে দি, এখন। উঠুন।

অবনী কহিল—মশারি থাক্, কুন্দ। একটু গল্প করি, এসো...

কুন্দ কহিল—গল্প কাল করবেন। আজ আমার বড্ড ঘুম পেয়েচে।

অবনী কহিল—বিয়ের তারিখ-টারিখের কথা মার কাছে কিছু শুনেচো?

কুন্দ কহিল—না। তাঁদের সঙ্গে আগে কথাবার্ত্তা হোক্...!

অবনী কহিল—মার সঙ্গে যখন এ কথা হয়, তুমি ছিলে?

কুন্দ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

অবনী কহিল—নির্ম্মলা ?

কুন্দ আবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ছিল।

অবনী কহিল—নির্ম্মলার মত আছে ?

কুন্দ কহিল— মুখে কিছু বলেনি...

অবনী কহিল—হুঁ।...সেই সঙ্গে একটা নিশ্বাস পড়িল।

কুন্দ কহিল—তাঁর মত আছে, নিশ্চয়।

আশার উচ্ছ্বাসে মন প্রদীপ্ত হইল। অবনী কহিল—কিসে জানলে ?

কুন্দ কহিল—সেখানেই সে বসে রইলো, উঠে গেল না। গিরীন বাবুর বৌ একটু তামাসা করলেন, করে বললেন—আপনার উপর সেদিন এমন অভিমান হয়েছিল যে কখনো যে-ভাইয়ের কথা ঠেলে নি, আপনার উপর অভিমানে তাও সেদিন করেছিল...তাতে হাসলে !

ও...! সেদিনকার ঘটনা তাহা হইলে...?

অন্ধকারের পর্দ্দা ঠেলিয়া এক মুহূর্ত্তে অনেকখানি আলো জল্‌জল্‌ করিয়া উঠিল! সেই বায়োস্কোপ...কুন্দ সঙ্গে ছিল...গিরীনের সেই উচ্ছ্বাস...তাই ? তাই...তাই বটে !

অবনী ডাকিল—কুন্দ...

উচ্ছ্বসিত আগ্রহে সেদিনকার কাহিনী সে বলিতে যাইতেছিল, চট্ করিয়া মনে হইল, না, বলা চলে না। সে পরিহাস কুন্দকে লক্ষ্য করিয়াই মুখর হইয়াছিল !...অবনী চুপ করিল।

কুন্দ তা লক্ষ্য করিল লক্ষ্য করিয়া কহিল—কি বলছিলেন ?

অবনী কহিল—এখন থাক্, পরে বলবো'খন। মানে, একটি পাত্র তোমার জন্য ঠিক করেচি। তোমার পছন্দ হবে... নিশ্চয়।

কুন্দ কহিল—আগে নিজের আনন্দ কায়েমি করুন, তারপর আমার পানে চাইবেন। কুন্দ হাসিল, ম্লান হাসি! অবনীর তা নজরে পড়িল না।

...সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে কুন্দ আসিয়া দেখা দিল। অবনী কহিল,—এসো...

কুন্দ কহিল—সুখবর আছে। বিয়ে এই আষাঢ়ে...

অবনী কহিল—তোমায় পুরস্কার দেবো।

কুন্দ কহিল—আমি তার প্রত্যাশী নই। জোর করিয়া সে মুখে হাসি আনিল।

অবনী কহিল,—প্রত্যাশী না হও, আমার কর্ত্তব্য আমি করবো।...আজই সে পাত্রকে এখানে আনবো...এনে মাকে দেখাবো।

কুন্দ কহিল—আরো খপর আছে...

অবনী কুন্দর পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কুন্দ কহিল,—মা এই সকালেই ওঁদের বাড়ী যাচ্ছেন।.

অবনী বলিল,—তুমি যাচ্ছো?

—না।...যাই, আপনার চা আনি। জল চড়িয়ে এসেচি... এখনি ফুটে উঠবে।...

অবনী কহিল—থাক্ চা। ঐ জানো! শুধু চা আর চা!

নয় মশারি ফেলে দি...! কেন, দু'দণ্ড বসে গল্প করতে পারো না? আগে তো এসে বসতে, গল্পও করতে!

কুন্দ উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল...সে দৃষ্টি পড়িল ক্রমে টেবিলের উপর সাহসিকার খাতায়। কুন্দ কহিল—একটা বখশিসের প্রত্যাশায় আছি...বটে!

—কি?

—ঐ সাহসিকাখানা লিখে শেষ করুন। যেমনই হোক্! আপনার হাতে হেমনলিনীর ভাগ্য কেমন গড়ে ওঠে—দেখি। এর পর আর সময় পাবেন না!...পলতার মাঠ আছে, বৌ আসচে...

হাসিয়া অবনী কহিল—যা বলেচো! রাত্রে একটা কথা ভাবছিলুম,...উপন্যাসে এরা নেহাৎ মিথ্যা কথাও লেখে না! তবে প্রেম বস্তুটা নিয়ে যে রকম কলরবের সৃষ্টি করে, জীবনে তা ঘটে না! এই আমাদের দৃষ্টান্তই ধরো...অবনী কুন্দর পানে চাহিল।

কুন্দর বুক কাঁপিয়া উঠিল। বিস্ফারিত চক্ষে সে অবনীর পানে চাহিল। অবনী কহিল,—নির্ম্মলার সঙ্গে প্রথম দেখা—সেদিন আমার মনে একটু চাঞ্চল্য ঘটে ছিল—কিন্তু মনকে থাবড়ে থামিয়ে ছিলুম। ও চিন্তাও আর করিনি। কাল মা বিয়ের কথা পাড়বামাত্র আমার মন এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো...কিন্তু কৈ, নির্ম্মলার জন্য হা-হুতাশও কখনো করিনি, তার নামে কবিতাও লিখিনি। অথচ উপন্যাস হলে আমায় নিয়ে ঐ সব ঔপন্যাসিক

কি সমারোহই না বাধিয়ে তুলতো! তাদের হাতে একটা আস্ত জরদ্গব বনতুম!...

নিশ্বাস চাপিয়া কুন্দ কহিল—সে তো বুঝচি। এখন সাহসিকার যা-হয় একটা গতি করে দিন্। আপনার হাতে হেমনলিনীর কি হয়, দেখি।

অবনী কহিল—বেশ, লিখবো।...কিন্তু তুমি একটু পরামর্শ দাও...

কুন্দ কহিল—আমি কি পরামর্শ দেবো! আমি ও ভাবতে পারি না।...কল্পনা-শক্তি থাকলে কি আর আপনার অপেক্ষায় থাকতুম, না, আপনার খোসামোদ করতুম? নিজেই নিজের সাহসের ইতিবৃত্ত লিখে ছাপিয়ে ফেলতুম।

অবনী কহিল—তুমি কেন লেখো না, কুন্দ? আমি তাই ভাবি...তোমার কথাবার্ত্তা শুনলে মনে হয়, তোমার শক্তি আছে...কথা যা বলো, সাহিত্যে তা স্থান পাবার যোগ্য! এই কথাই যদি গুছিয়ে লেখো...

হাসিয়া কুন্দ কহিল—তাহলে একেবারে বঙ্কিমচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠি...না?

অবনী কহিল—তা না হও, অন্ততঃ অনেক ভুঁইফোঁড় লেখকের দর্প যে চূর্ণ করতে পারো, তাতে সন্দেহ নেই!

—চেষ্টা দেখবো।...কিন্তু না, আর না। চায়ের জল ওদিকে ফুটে উবে গেছে এতক্ষণে! আমায় আবার কষ্ট করতে হবে। অনর্থক আপনার জন্য এই ভোগান্তি...

...... পলতার বাগানের কথা পাকিয়া উঠিতে বাধা পড়িল না। যে-হেতু ব্যবসায়ের লক্ষ্মী সুদূরের অস্পষ্ট অন্তরালে থাকিলেও গৃহের লক্ষ্মী একান্ত সন্নিকটবর্ত্তিনী ছিলেন! এই কারবারের কথায়-আলোচনায় গিরীনের গৃহে তার যাতায়াত সঘন হইয়া উঠিল। এবং সেই অবসরে নির্ম্মলার গান, গল্প... অবনীর সম্মুখে পৃথিবীকে বসন্তের মোহন শ্রীতে বিচিত্র-রমণীয়, পুষ্প-ভূষণে বিভূষিত করিয়া তুলিতেছিল!...

পনেরো দিনের মধ্যে জমি লীজ্ লওয়া হইল। তার পর টিউব-ওয়েল, পুষ্করিণী, উদ্যান...সে-সবের আয়োজনে কোথাও ত্রুটি রহিল না।...

এবং একদিন আষাঢ় আসিয়া দেখা দিল। বর্ষার সুরে দিকে-দিকে মাতন! বিবাহের আনন্দ-রাগিণী বর্ষার সে সুরে...এবং এ আনন্দে যোগ দিতে অবনীর দিদি মনোরমা আসিল পুনা হইতে; মনোরমার স্বামী পুনায় ডাক্তার; তার আসা হইল না। হাসপাতাল ছাড়িয়া আসিবার উপায় নাই। আরো আত্মীয়-কুটুম্বে গৃহ ক্রমে ভরিয়া উঠিল।

এই ভিড়, এই কলরব...কুন্দ কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ফাই-ফরমাশ খাটা, নিজের হাতে সকলের সেবা-পরিচর্য্যা...সে ভার কুন্দর। তার নিমেষ-বিরাম নাই! সকলের কাছে যা

বলিতে ছিলেন—এটি আমার ছোট মেয়ে!...এটির বিয়ে দিলেই আমার ইহলোকের কর্ত্তব্য শেষ হয়!...

গায়ে হলুদের দিন। সকালে কুন্দ মনোরমার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। মনোরমা ডাকিল—মা...

মা কাছে বসিয়া ছিলেন, কহিলেন—কেন রে?

মনোরমা কহিল—কুন্দর বিয়ে দেবে? পুনায় একটি পাত্র আছে। এর সঙ্গে হাসপাতালে কাজ করে, মন্মথবাবু। বয়স অল্প। দেখতে ভালো। চমৎকার লোক; অমায়িক; বাপ লাহোরের বড় উকিল; বড় ভাই বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে এসেচেন। মন্মথবাবু বছর দুই হলো লাহোর থেকে পাশ করে বেরিয়ে পুনায় চাকরি নিয়েচে—এর পর বিলেত যাবে। বিয়ের জন্য বাপ ভালো পাত্রী খুঁজচেন। আমায় অনেক করে বলেচেন। তোমার মত হয় তো বলো, আমি তাঁদের লিখি। আমার পছন্দতেই তাঁদের পছন্দ।...ভাবতে হবে না। কি বলো?

মা কহিলেন—সে বেশ হবে যে! দুটী বোনে কাছাকাছি থাকবি। তুই আজই চিঠি লেখ্। এর পর বিয়ের গোলমালে কথা গুলিয়ে যাবে!...তুই লিখে দে, এই মাসের শেষেই আমি বিয়ে দিতে রাজী আছি।

মনোরমা কহিল—কেমন কুন্দ, বেশ হবে না ভাই? এক জায়গায় থাকবো।...আজই আমি চিঠি লিখচি।

কুন্দ কোনো কথা বলিল না—চুপ করিয়া চুল বাঁধিতে লাগিল।...

মা বলিলেন—সত্যি সত্যি লিখে দে মা...

মনোরমা কহিল—এই যে, আমার চুলটা বাঁধা হলেই লিখবো। বড্ড মনে পড়ে গেছে মা...

মা কহিলেন—ওরও বিয়ের ফুল ফুটলো বুঝি! ছাখো!...

তার পর শুভ লগ্নে নির্ম্মলাকে বিবাহ করিয়া অবনী গৃহে ফিরিল। কুন্দ শাঁখ ছাড়িতে চায় না। অবনী কহিল—যে ঘটা করে শাঁখ বাজাচ্ছো কুন্দ—দাঁড়াও, মন্মথনাথের আগমনীতে দেখিয়ে দেবো, ও-বিদ্যায় আমিও আনাড়ি নই!...

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিরীন আসিয়াছিল—কি-একখানা প্ল্যান লইয়া। সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দুজনে অজিতের গৃহে চলিল।...

তার পর যখন অবনী গৃহে ফিরিল, রাত তখন দশটা। বাড়ীতে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে।

সজল চোখে মা আসিয়া বলিলেন, কুন্দকে পাওয়া যাইতেছে না!

সে কি! অবনী লাফাইয়া উঠিল, কহিল—কোথায় গেল?

মা বলিলেন—তখন রাত আটটা—কুন্দ, বৌমা আর মনু—তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসলো। কুন্দ কিছুতে খাবে না—অনেক বলায় বসলো। দিব্যি হাসি-খুশী, গল্প। মনু বললে—চলো পুনায়—ও-দেশী খাবার ছাড়া তোমায় আর কিছু খেতে দেবো না! তা নিয়ে কেমন আমোদ-আহ্লাদ করছিল...তার পর হঠাৎ ঘণ্টাখানেক পরে আর দেখা নেই...

অবনী কহিল—মামা কোনো ফন্দী-ফিকির করে...?

মা কহিলেন,—না। ঠাকুর ওর মামার বাড়ী চেনে। পাঠিয়েছিলুম। সেখানে যায় নি!...

—তবে ?...

অবনী গায়ে জামা দিল। হঠাৎ টেবিলের উপর চোখ পড়িল। সাহসিকার খাতা...তার মধ্যে একটা বড় খাম; খামের আধখানা বাহির হইয়া আছে। অবনী টানিয়া দেখে, খামে তার নাম লেখা। লেখা কুন্দর। কম্পিত হাতে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া সে দেখে, লেখা আছে,—

মরুর বুকে বসিয়া সাগরের স্বপ্ন দেখিলে জল মেলে না! সে স্বপ্নে পিপাসাও মেটে না। মরুর বুকে যার বাস, তার এমন সুধার পিপাসা কেন, বলিতে পারেন? মুনি-ঋষিরা বলেন,—সবই মায়া! এই সুধার পিপাসা, এ'ও মায়া! তা যদি হয়, তবে এ মরুর মায়ায় মরি কেন?

থাকা গেল না। অনেক চেষ্টা করিয়াছি। জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়াছি, বুকের বেদনা তবু তো যায় না! আপনাদের এত সুখে আমার নিশ্বাস পাছে লাগে—তাই চলিলাম।

ভয় নাই। কায়ে-মনে আপনাদের স্নেহের অপমান আমার দ্বারা কখনো ঘটিবে না। এক একবার শুধু কুন্দর কথা মনে করিবেন—অভাগিনী কুন্দ!

'সাহসিকা' উপন্যাস—তার সব মিথ্যা, জানি। সে মিথ্যার বুকে মিথ্যা করিয়াও যদি লিখিতেন, বসন্তকুমার হেমনলিনীকে ভালোবাসিয়াছিল!

হেমনলিনী কেহ নয়,—জানি! তবু ঐ উপন্যাসের হেমনলিনীর সে-সৌভাগ্য দেখিলে একটু আরাম পাইতাম! ভাবিতাম, বেচারী হেমনলিনীর দুঃখ আপনি বুঝিয়াছেন!

কিন্তু এ দুরাশা—আমি বুঝি নাই। আকাশের চাঁদ...চাঁদে লোভ? এমন লোভীর চোখে যদি অশ্রু না ঝরে তো কার চোখে ঝরিবে! বড় সুখে ছিলাম, কিন্তু—ভাগ্য! তার উপর কারো হাত নাই—ইহা ভাবিয়া আমায় মার্জ্জনা করিবেন।

একটি নিবেদন, 'সাহসিকা' উপন্যাস শেষ করিবেন। উপন্যাস তো! দয়া করিয়া বসন্তকুমারের পায়ের কাছে হেমনলিনীকে একটু জায়গা দিলে বিশ্বে কাহারো কোনো ক্ষতি হইবে না। যেখানেই থাকি, 'সাহসিকা' বই ছাপা হইলে যেমন করিয়া হোক একখানি সংগ্রহ করিব। শুধু ঐ লেখাটুকু দেখার আগ্রহ! এও কি কুন্দর বড় বেশী দুরাশা?

চিঠি পড়া শেষ হইলে চিত্রার্পিতের মত অবনী দাঁড়াইয়া রহিল। তার মনে হইল, দুনিয়ার:গতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে জীবনের স্পন্দনটুকুও!...

আকাশে নক্ষত্রগুলা কোন্ ছায়ার অন্তরালে মিশিতে চলিয়াছে! চাঁদ? ম্লান পাণ্ডু, বিবর্ণ! বাতাসে কার বেদনার সুর হা-হা করিয়া ফিরিতেছে!

অবনী চেয়ারে বসিয়া পড়িল।...অবসন্নের মত!...

মা. আসিয়া কহিলেন,—বেরুচ্ছিস? যা বাবা—কিন্তু কোথায় খোঁজ করবি, বল্ দিকিন্...?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অবনী মার পানে চাহিল; কম্পিত স্বরে কহিল—কোথায় যাবো!...তাকে আর পাবো না, মা!

মা অবাক। কহিলেন—সে কি!...ও চিঠি...তার? কি লিখে গেছে?

অবনী কোনো জবাব দিল না। তার দুই চোখ জলে ভরা! নির্ব্বাক্ বেদনায়, সজল চোখে বাহিরের আকাশের পানে সে চাহিয়া রহিল।

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

এই লেখকের লেখা অন্য বই

উপন্যাস

পছায়া	২৲
ধাঁধি	২॥০
পিয়ারী	২৲
চুল ঝটিকা	২৲
লজ্জাবতী	২৲
বহ্নিশিখা	২৲
গরীবের ছেলে	২৲
মুক্ত পাখী	২৲
নারী	২৲
বিনোদ হালদার	২৲
নিশির ডাক	২৲
স্ত্রীবুদ্ধি	১৸০
বাদলা	১॥০
কাজরী	১॥০
নিরুদ্দেশের যাত্রী	১॥০
ছোট পাতা	১॥০
মনের মিল	১৲
দরদী	১৲
সোনার কাঠি	১৲
প্রেয়সী	১৲
মমতা	১৲
শান্তি	১৲
নবাব	২॥০
মাতৃঋণ	১॥০
বন্দী	১৲
পথের পথিক	।৶০
নেপথ্যে	॥০
লাল ফুল	যন্ত্রস্থ
ধূলামাটী	"
অতঃপর	"
জীবন-স্বপ্ন	"

ছোটগল্প

তরুণী	[illegible]
যৌবরাজ্য	[illegible]
মৃণাল	১।০
পিয়াসী	১।০
মণিদীপ	১৲
পুষ্পক	১৲
চাঁদমালা	১৲
শেফালি	৸০
নির্ঝর	১৲
পরদেশী	১৲
বৈকালি	॥০

নাট্য

স্বয়ংবরা	১৲
লাখ টাকা	১৲
হারানো রতন	।৶০
দরিয়া	॥০
রূমেলা	॥০
হাতের পাঁচ	।/০
শেষ বেশ	।/০
গ্রহের ফের	।০
দশচক্র	।৶০
যৎকিঞ্চিৎ	॥০
পঞ্চশর	।৶০

ছেলেমেয়েদের গল্প-উপন্যাস

লাল কুঠি	১॥০
মা-কালীর খাঁড়া	১৲
পাঠান মুল্লুকে	১।০
সাঁঝের বাতি	॥০
ফুলের পাখা	॥০
তারার মালা	॥০
ছায়া-দানব	যন্ত্রস্থ

সকল গ্রন্থই কলিকাতার প্রধান-প্রধান পুস্তকালয়ে; এবং ৮২।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।